ঘেরাও

দীপক
চৌধুরী

লোকসভার সদস্য

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু

বন্ধুবরেষু

ছ'টা বছর পার হয়ে গেল। ছেষট্টি সালের শেষ দিন আজ। ঠিক ছ'বছর আগে সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন গোপীমোহন সিংহ।

বেলা ন'টা। বাইরে বেরুবেন তিনি। শয়ন-কামরার দক্ষিণ দিকে বড় বড় তিনটে জানালা। খোলা রাখলে হু হু করে হাওয়া ঢোকে। হাওয়া ঢুকবে বলেই বছর পাঁচেক আগে বাড়িটা কিনে রেখেছিলেন। পুরনো বাড়ি। তা হোক, বাড়িটার সামনে-পিছনে এক বিঘে জমি আছে। এই বাজারে বিশ হাজার করে প্রতি কাঠা জমি তিনি বেচে দিতে পারেন। প্রতি কাঠা যদি বিশ হাজার করে হয় তা হলে এক বিঘে জমি বেচলে কত টাকা আসবে? এটা শুধ বালিগঞ্জ এলাকা নয়, এটা লেকের কাছাকাছিও বটে। উল্টো দিকে কেয়াতলা লেন। নতুন নতুন বাড়ি উঠছে অনেক। এক কাঠা জমিও আর খালি পড়ে নেই। তাঁর নিজের বাড়ির আশেপাশেও বিরাট বিরাট বাড়ি উঠেছে। গরাদের ফাঁকে মুখ ঠেকিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলেন গোপীমোহন। কেয়াতলা লেনটা তাঁরই বাড়িতে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ দিকটা চিরকাল ফাঁকা থাকবে। তিনি অবিশ্যি চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। পৃথিবীর কোন জিনিসই চিরকাল বেঁচে থাকে না। সব জিনিসেরই শেষ আছে। তা হোক, উত্তর পুরুষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন তিনি। তারা তাঁকে সুখ্যাতি করবে, স্মরণ করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তারা বলবে, মাত্র সাতশ টাকা মাইনে

পেয়েও দাছ প্রায় সাত লাখ টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন। আর নগদ? তার হিসেব গোপীমোহন ছাড়া কেউ জানে না। এই বাড়িটা পুরনো বটে, কিন্তু তাঁর শয়ন-কামরার দেওয়াল কটা নতুন কায়দায় নির্মাণ করা হয়েছে। দেওয়ালের বুকে বড় বড় গহ্বর। বাইরে থেকে দেখা না। গহ্বরগুলোর ভেতরে নগদ টাকা আর সোনা।

বছরেব আজ শেষ দিন। কাল থেকে নতুন বছর শুরু হবে। এই দিনটিতে গোপীমোহন নিউ মার্কেট গিয়ে প্রায় পাঁচশ টাকার জিনিসপত্র কেনেন। পরের দিন কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর বাড়ি গিয়ে উপহারগুলো নিজে হাতেই দিয়ে আসেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও এই নিয়মটা তিনি এখনো মেনে চলছেন। বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট চলছে বটে, কিন্তু পুরনো হিসেব চাইবাব মতো ছু-তিনজন কর্মচারী এখনো রয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আজো চাকরি করছেন। আরো বছর ছুই চাকরি করবার পর তাঁরা অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁদের জন্মই ভয়। সেই জন্মই বছরের প্রথম দিনটাতে উপহার দেওয়ার নিয়মটা এখনো বজায় রেখেছেন গোপীমোহন। তাঁরা অবসর গ্রহণ করার পর আর ভয় থাকবে না। পুরনো হিসেবের গর্তের মধ্যে হাত ঢোকাবার মতো সব ক'টি অফিসারই পেনশন নিয়ে বালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকবেন। অতএব আরো ছুটো বছর ভয়েব মধ্যেই সময় কাটাতে হবে তাঁকে। এবং বছরের প্রথম দিনটিতে উপহারও কিনতে হবে।

কিন্তু নির্বাচনের খবরাখবর যা কানে আসছে তাতে মনে হয়, এবার বোধহয় কংগ্রেস আর রাজত্ব করতে পারবে না। বামপন্থীরা শাসনভার গ্রহণ করবে। তখন আবার কি হবে গোপীমোহন তা জানেন না। হঠাৎ যেন তিনি নিজেকে নিরুপায় ভাবতে লাগলেন। তবে আর নিউ মার্কেট গিয়ে পাঁচশ টাকা জলে ফেলার দরকার কি? বামপন্থীদের নির্বাচন ফাণ্ডে এই টাকাটা দিয়ে দিলে কেমন

য় ? শয়ন-কামরায় পায়চারি করছেন গোপীমোহন আর ভাবছেন বামপন্থীদের ফাণ্ডের কথা। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি টাকা দান করা যায়। ঘুষ নেওয়ার চেয়ে টাকা দান করা কঠিন কাজ। একজন পেনশনপ্রাপ্ত কর্মচারী যদি পাঁচশ টাকা দান করেন তাহলে বামপন্থীরা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢোকবার আগেই তো তাকে চিনে ফেলবে। না, আগে থেকেই তাদের খাতায় নামধাম লিখিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কাল-কেউটের ল্যাজ দিয়ে নিজের কান খোঁচাতে যাওয়া উচিত নয়। যেমন চলে আসছে তেমনি চলুক। নির্বাচনের পরে কংগ্রেস যদি সিংহাসন না পায় তখন ভেবেচিন্তে দেখা যাবে কি কৌশল তিনি অবলম্বন করবেন। গোপীমোহনের ধারণা, বুদ্ধির ব্যাপারে বাম কিংবা দক্ষিণ কোনো দলই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

পায়চারি করছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। বাড়ির দক্ষিণটা চিরকালই খোলা থাকবে। সিংহ-ভবনে হাওয়ার অভাব কোনদিনই হবে না। কেয়াতলা লেনটা পার হয়ে গেলেই বালিগঞ্জের সুবিখ্যাত হ্রদ। সারা বছরই জল থাকে হ্রদে। জল কখনো শুকোয় না।

ওখানেই ডুবে গিয়েছিল মমতা। ডুবে যাওয়ার পর গোপী-মোহনের মনে পড়েছিল যে মমতা সাঁতার জানত না। দুটি সন্তান প্রসব করবার পর মমতা সেই যে মোটা হতে লাগল তারপর আর কখনো তাকে রোগা করা যায় নি। কত ডাক্তার তাকে দেখেছে, কত ওষুধ সে খেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কাজ হয় নি। পা হড়কে হ্রদের জলে যখন সে পড়ে গিয়েছিল তখন মমতার ওজন ছিল পৌনে তিন মণ। শুধু বেঁচে থাকা ছাড়া ঐ দেহ নিয়ে মমতা কোনো কাজই করতে পারত না। অথচ গোপীমোহনের বয়স তখন মাত্র চল্লিশ। নিয়মিত পশু-প্রোটিন খাওয়ার ফলে গোপীমোহন পঁচিশ বছরের যুবকের শক্তি রাখতেন দেহে।

বোধহয় সেই কারণেই কলকাতার পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করেছিল। শুধু সন্দেহ। তারপর দেয়ালের বুক থেকে এক বাণ্ডিল নোট বার করে উপহার দেওয়ার পর মমতার মৃত্যুর খবরটা এমন কি বাংলা দৈনিক কাগজেও প্রকাশিত হয় নি।

সেই সময় (অর্থাৎ ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাওয়ার পর) মনে মনে খুব হেসেছিলেন গোপীমোহন সিংহ। মেয়েদের অস্তিত্বের মধ্যে চোদ্দ আনাই দেহ। বাকী দুই আনা হচ্ছে মন। যার চোদ্দ আনার ওজন হচ্ছে পৌণে তিন মণ তার বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে মহা পাপ। সেই পাপ থেকে মমতা যদি রক্ষা পেয়ে থাকে তা হলে পুলিশ কিংবা দৈনিক কাগজ তার জন্য লড়াই করতে যাবে কেন?

জানালার কাছ থেকে সরে এলেন গোপীমোহন। বেঁটেমার্কা মানুষটি। মাথায় আধপাকা কদমছাট চুল। গাট্টাগোট্টা চেহারা। গায়ের রঙ কালো। নাকের তলায় টুথব্রাশের মতো ইঞ্চিখানেক গোঁফ। দেহের অনুপাতে হাত দুটো লম্বা। কিন্তু আঙুলগুলো শিশুদের মতো কচি এবং ছোট।

ঐ দশটি আঙুল দিয়েই লাখ লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছেন তিনি।

শয়ন-কামরার পুব দেওয়ালে ছেষট্টির ক্যালেণ্ডারটা ঝুলছে হাওয়া লাগতেই ছেড়া কলাপতার মতো শেষ পাতাটা উড়তে লাগল। ক্যালেণ্ডারের দুটো অংশ। ওপরের অংশে ছবি, নিচের অংশে বার এবং তারিখ। ছবিটা সুন্দর। একটি বিবস্ত্রা নারী দুই হাঁটুর মাঝখানে তানপুরা ঠেকিয়ে সুর ভাজছে। ভঙ্গিটা সেই রকমের। স্ত্রীলোকটির পেছন দিকে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র আঁকা।

বেলা দশটা বাজে। এবার বেরিয়ে পড়া দরকার। পুরনো ক্যালেণ্ডারটা দেওয়ালের গা থেকে খুলে নিয়ে এলেন। তলার অংশটা ছিড়ে ফেললেন। সন তারিখ আর দরকার নেই। ওগুলো পুরনো। জীবনের ক্যালেণ্ডার থেকেও ওগুলো সব মুছে গিয়েছে।

শবদেহের মতো এই শেষ পাতাটারও আব কোন মূল্য নেই। ছবিটা শুধু বাঁধিয়ে রাখতে হবে। বিবস্ত্রা স্ত্রীলোকের ছবিই তিনি পছন্দ কবেন। এটা নিয়ে পনেরোটা হল। শয়ন কামরার পুব আর পশ্চিম দেওয়ালে গত চোদ্দটা বছরের চোদ্দটা ক্যালেণ্ডারের ছবি তিনি বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছেন। এটা নিয়ে পনেরোটা। মমতা মারা গিয়েছে ঠিক পনেরো বছর আগে।

ভুল হওয়ার উপায় নেই। কষ্ট কবে স্মবণ কববাব দরকার হয় না। শুধু ক্যালেণ্ডাবেব ছবিগুলো গুণে ফেললেই মমতাব মৃত্যুব বছরটা তিনি ধবে ফেলতে পারেন। এবং মমতাব শোচনীয় মৃত্যুব দিনটিকেও ভুলতে পাবেন না। আজ থেকে পনেবো বছব আগে স্ত্রী তাঁব মারা গিয়েছেন। দেওয়ালেব দিকে চেয়ে বছবেব হিসেবটা তিনি মিলিয়ে নিলেন একবাব। হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। ছেষট্টিব ক্যালেণ্ডাবটা যোগ দিলে পনেবো বছবই হবে।

দবজার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উকি দিচ্ছিল কানাই মাইতি। প্রায় ত্রিশটা বছবই কাটিয়ে দিল গোপীমোহনেব সংসাবে। বাডিব পুবনো চাকব। আঠাব মতো লেগে বইল সিংহ পবিবাবে। বিয়ে কবেনি। আর কববেও না। বয়স হল পঞ্চাশ। পুবো কর্ম-জীবনটাই কাটিয়ে দিল এখানে। একটা পুবো জীবনেব মানচিত্রটা সে দেখেছে। এখনো দেখছে।

গোপীমোহন দরজা খুলে বাইবে বেবিয়ে এলেন। বছবের শেষ দিন আজ। নিউ মার্কেটে যাচ্ছেন সওদা কবতে।

কানাই জিজ্ঞাসা কবল, 'কখন ফিববে, বাবু? দেরী হবে নাকি?'

'কাল পয়লা জানুয়াবী। জিনিসপত্র কেনাকাটা করব। ফিরতে ফিরতে একটা বাজবে।'

একতলায় নেমে যেতে লাগলেন গোপীমোহন। পুবনো আমলের কাঠেব সিঁড়ি। দুদিকে কাঠের বেলিং। রেলিং ধরেই

নিচে নামছিলেন তিনি। বুড়ো লোকের নড়বড়ে দাঁতের মতো দুলে উঠল রেলিং। কানাই বলল, 'এতো পয়সা তোমার। এইসব ইট, সুরকি আর পুরনো কাঠ ফেলে দিয়ে নতুন বাড়ি তৈরী করো না কেন?'

জবাব দিলেন না গোপীমোহন। নাকের তলায় টুথব্রাশের মতো গোঁফটা শুধু নড়ে উঠল একটু।

'বাবু, চারদিকে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তোমার বাড়ির একি ছিরি। মহারোগের ঘায়ের মতো—'

গোপীমোহন ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দিকে দৃষ্টি তুলতেই কথাটা শেষ করতে পারল না কানাই।

বাবুর পেছনে পেছনে সেও বেরিয়ে এল বাইরে। বেলা দশটা বাড়ির সামনে তবু অন্ধকার। গাছ-গাছড়া আর ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে সর্বত্র। বাইরে থেকে একটা ভূতের বাড়ির মতো মনে হয়। দেওয়ালের গায়ে বটগাছ গজিয়েছে। এগুলো গোপীমোহন নিজে হাতে রোপণ করেছিলেন। গোড়ার দিকে জল সেচন করতেন নিজে হাতে। তারপর যখন চারাগাছগুলো কৈশোরে পদার্পণ করল তখন আব যত্ন নেয়ার প্রয়োজন হল না। তারা নিজের চেষ্টাতেই কৈশোর পার হয়ে যাচ্ছে।

কানাই বলল, 'তুমি বোধহয় একটা দিকে নজর দাওনি বাবু—'

'কোন দিকে?'

'একতলার স্নানঘরের দিকে।'

'কি হয়েছে সেখানে?'

'তিন-চার বছর আগে' সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে কানাই বলতে লাগল, 'ওই গাছটা তুমি ওখানে পুঁতে দিয়েছিলে। খুব তেজী বট। দেওয়াল ফুঁড়ে একটা শেকড়

চলে এসেছে স্নানঘরের মধ্যে। এখন দেখছি, স্নানঘরের একটা দেওয়াল যে-কোনো দিন ভেঙে পড়তে পারে। বড্ড তেজী বট, বাবু।'

'স্বাধীন ভারতবর্ষে কার না তেজ বেড়েছে বল্? শুধু একটা বাচ্চা বটগাছকে দোষ দিলে চলবে কেন?' একটু থেমে গোপীমোহন আবার বললেন, 'এই যে চারদিকে নতুন নতুন বাড়ি দেখছিস, এদের তলাতেও শেকড় আছে। কালো টাকার শেকড়। তুই তো রান্নার কাজ করিস, শুধু কড়াই আর হাঁড়ির মধ্যে সারা জীবন দৃষ্টি আবদ্ধ করে রাখলি। কী না দেখেছি আমি, আর কত না দেখছি! গ্যারাজের দরজা খুলে দে।'

ভাঙাচোরা গোয়ালের মতো একটা গ্যারাজ। চারদিকে কঞ্চির বেড়া। মাথার ওপরে টিনের ছাদ। তাও পুরনো টিন। চালুনির মতো অসংখ্য ছিদ্র। বর্ষার সময় ত্রিপল দিয়ে গাড়িটা ঢেকে রাখতে হয়।

গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করলেন গোপীমোহন। উনিশশে বত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়ি। ইচ্ছে করলে লাখ টাকা দিয়ে সর্বাধুনিক আমেরিকান গাড়িও তিনি কিনতে পারতেন। সরকারী কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বার ভয় আছে বলেই তাঁকে বত্রিশ সনের ফোর্ড গাড়ি চালাতে হচ্ছে। আর বছর দুই গুঁজে পড়ে থাকতে পারলেই বিপদ তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এখন ভয় শুধু বামপন্থীদের। তারা এলে হয়তো নতুন করে হিসেব চাইতে পারে।

বাইরের ফটকটা খুলে দিয়েএকপাশে অপেক্ষা করছিল কানাই। গাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতো বেশি আওয়াজ করে যে, পাড়ার ছেলে ছোকরারা ছুটে এসে গেটের পাশে দাঁড়ায়। বলে, 'দাদু, ও দাদু, গাড়িটা ঠেলব? আজ না হয় আমাদের চার আনা পয়সা দিয়ো।'

মাঝে মাঝে ঠেলতে হয়। ঠেলতে ঠেলতে কোন কোন দিন

গোল পার্ক পর্যন্ত দিয়ে আসে ছেলেরা। আজ আর ঠেলবার দরকার হল না। প্রথম চেষ্টাতেই গাড়িটা স্টার্ট নিল।

পূর্ণ দাস রোড ধরে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলেন গোপীমোহন। যাওয়ার পথে পরিমলের সংসারটা একবার দেখে যাবেন। পরিমল হচ্ছে তাঁর বড় ছেলে। পণ্ডিতিয়া রোডের যে অংশটায় বস্তি সেখানে একটা ঘর ভাড়া করে বাস করছে সে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় আহাম্মক। ছেলেবেলা থেকেই রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ ছিল। সে যে ইস্কুলে মাস্টারী করবার জন্য বি. এ. বি. টি. পাস করেছিল তাও তিনি জানতেন না। যেদিন জানলেন সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'তোকে আমি বিলেতি বণিক-অফিসে বড় চাকরি দিতে পারব। বড় বড় সাহেব কোম্পানির মুরুব্বীদের আমার কাছে আসতে হয় পরিমল। আমি যদি তাঁদের কাছে শুধু ঘোষণা করি যে তুই বি. এ. পাস করেছিস, তা হলেই তোকে তাঁরা খোসামোদ করে চাকরি করতে নিয়ে যাবেন।'

'না, বাবা। আমি ইস্কুলে একটা চাকরি নিয়ে ফেলেছি। পড়ানোর কাজে আনন্দ পাই। কচি কচি ছেলেগুলোকে ছেড়ে আসতে মন চায় না।'

হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন গোপীমোহন। প্রায় মিনিট দুই পর্যন্ত প্রজাপতির পাখার মতো গোঁফটা তাঁর ওপরে নীচে ওঠানামা করেছিল।

পরিমল বলেছিল, 'তোমার মতো একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এই ব্যাপারটা মেনে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তোমায় আমি কষ্ট দেব না, বাবা। আমি আসছে মাস থেকে আলাদা থাকব।'

'আমি তো তোমায় যেতে বলিনি।'

'মুখে না বললেও তোমার মনের কথা আমি জানি,

বাবা। তা ছাড়া—তা ছাড়া আমি বিয়ে করব বলে স্থির করেছি।'

'সে তো খুবই আনন্দের কথা, পরিমল।'

'তোমার কাছে নয়। আমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে আমার চেয়ে বয়সে বড়। পূর্ববঙ্গের মেয়ে। বহুদিন আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে ছিল···মাঝে মাঝে ধরাও পড়ত···তখন পুলিশের হাতে কী যে লাঞ্ছনা ভোগ করত শুনলে বিশ্বাস করবে না। বড় অদ্ভুত মেয়ে!'

'কি রকম?' রুপোর খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে প্রশ্ন করেছিলেন গোপীমোহন।

'পুলিশেব লোকেরা ওকে বার দুই রেইপ করেছিল....মানে জেলের মধ্যেই—সুনন্দা তবু স্বীকারোক্তি করেনি।'

'গ্লোরিয়াস। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবিশ্যি যদি এই সব নারীধর্ষণের ইতিহাস কখনো লেখা হয়—পরিমল, এইসব জিনিসেব তুমি সন্ধান পেলে কি করে?'

'পার্টির খাতায় নাম লেখাবার পর।'

'পার্টি?' ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলেন গোপীমোহন।

'আমি মার্ক্সবাদী, বাবা।'

'তা হলে সুনন্দাকে তোমার বিয়ে করাই উচিত।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল পরিমল। শেষ কথাটা বলবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল সে। তবু দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল।

গোপীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকা ধার চাই বুঝি?'

'না।'

'তবে?'

'সুনন্দার আণ্ডারগ্রাউণ্ডেই বিয়ে হয়েছিল।'

'উত্তম! উত্তম! এর চেয়ে বড় চরিত্র ভারত ভূখণ্ডেও খুঁজে

পাওয়া যাবে না। আজই আমি সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ডক্টর মজুমদারকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করব। যদি থাকে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তার নাম বলে দেবেন।'

অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন গোপীমোহন। সব ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। যেন পরিমল তাঁর ছেলে নয়, অন্য কেউ হবে। কোনো জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলে, নয়তো রাস্তার ঐ রাম, শ্যাম কিংবা যদুবাবুর ছেলে। ওয়াক থুঃ! সত্যি সত্যি ঘরের মধ্যে থুথু ফেললেন গোপীবাবু। তারপর তিনি নাকের তলার টুথ ব্রাশটাতে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন একটি স্ত্রী-চরিত্র আবার বিয়ে করতে চাইছেন কেন? আর্থিক নিরাপত্তার জন্য যদি হয় তাহলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। দশ বিশ কি ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটা করে দিতে পারি। পণ্ডিতিয়া রোডের বস্তির আর কতই বা ভাড়া হবে। দৈহিক ব্যাপারটার জন্য তুমি কেন বিয়ে করতে যাবে? তা ছাড়া আণ্ডারগ্রাউণ্ডের বিয়েটা আইনত ভাঙল কি করে?'

'স্বামীটি আণ্ডারগ্রাউণ্ডেই মারা গিয়েছেন। একদিন মাঝরাত্রিতে পাকিস্তানের সশস্ত্র পুলিশ গুলি চালিয়েছিল···সুনন্দা পালাতে পেরেছিল, কিন্তু কমরেড একরামুল্লা পুলিশের গুলি খেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।'

'কি মুল্লা?' ভেংচে উঠলেন গোপীমোহন।

'কমরেড একরামুল্লা।'

'নাম শুনে তো মনে হচ্ছে নবাব-টবাব নয়। বড় জোর দু'চার বিঘে চাষের জমি ফেলে গিয়েছে। ছোট দরের চাষীটাষী ছিল।'

'বড় দরের কমরেড ছিল সে।'

'তাহলে তো দেখছি ল্যাণ্ডলেস লেবার। দিন মজুর।'

'শুধু সেইটুকু গৌরবচিহ্ন সঙ্গে নিয়ে সুনন্দা ফিরে এসেছে ভারতবর্ষে।'

'আর কোথায় যেতে পারত?'

মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল পরিমল। প্রশ্নটার জবাব দিতে পারেনি। তোমার প্রশ্নটা হাইপোথিটিক্যাল, প্রকল্প বিশেষ। সুতরাং জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, বাবা। আমি যাচ্ছি। সঙ্গে কোনো জিনিসই নিচ্ছি না। মাইনের টাকা দিয়েই দরকারী জিনিসপত্র সব কিনে ফেলেছি। তোমার বাড়ি থেকে কিছুই নিচ্ছি না।'

'আমার রক্ত, আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিতে পারবি? আমার বাইরে তোর নিজের অস্তিত্ব কতটুকু? শুধু মার্ক্সবাদের কয়েকখানা বই ছাড়া তোর নিজের বলতে কি আছে? সুনন্দা গর্ব করতে পারে। ডাঙায় দাঁড়িয়ে সে সাঁতার শেখবার চেষ্টা করেনি। সে জলে নেমেছে। বন্দুকের গুলি বুকের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু তোর বুকে তো আজ পর্যন্ত একটা খড়কের খোঁচা পর্যন্ত লাগে নি। কোনো দেশে শুধু ক'খানা বই পড়ে কেউ বিপ্লব এনেছে বলে আমি তো কখনো শুনি নি। যা, বস্তির ঘরে গিয়ে দিন কয়েক শুয়ে ছাখ। আহাম্মক কাঁহাকার! সর্বোৎকৃষ্ট পশু-প্রোটিন খেয়ে খেয়ে তেইশ বছর ধরে দেহটাকে তৈরি করেছিস। এখন এক্‌রামুল্লার বিবি সেটাকে ভোগ করবে। ওর গতর প্রতিদিনই তাজা হয়ে উঠবে আর তোর দেহটা যাবে শুকিয়ে। যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ কিংবা বিপ্লব যাই বলিসনা কেন সব কিছুর মূলে রয়েছে যৌন আর টাকা। একটা বিগড়ে গেলে অন্যটার কোনো মূল্য থাকে না। দুটোর মধ্যে সমানুপাতে ভারসাম্য আনতে হবে। তুই আনবি কি? শুধু সাম্য? আহাম্মক। আহাম্মক! ভাগো হিঁয়াসে—দূর হয়ে যা। ওয়াক থুঃ!'

দ্বিধা করতে করতে পরিমল তবু বলে ফেলেছিল, 'সুনন্দাকে আমি ভালবাসি বাবা।'

'ভালবাসবার মতো কলকাতায় আর কিছু ছিল না? তা ছাড়া

ভালবাসলেই বিয়ে করতে হবে কেন? বুর্জোয়া কাঁহাকার—পেতি বুর্জোয়া! মার্ক্সবাদের বই পড়ে-পড়ে বিপ্লবী। স্বর্গীয় পূর্ণ দাসও তোর চেয়ে খাঁটি বিপ্লবী ছিলেন।'

পূর্ণ দাস রোড ধরেই বত্রিশ সনের ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছিলেন গোপীমোহন। তেরো বছর আগেকার কথা। পরিমল এখনো সেই পণ্ডিতিয়া রোডের অন্ধকার অংশটাতেই বাস করছে। গত তেরো বছরে ইস্কুলের মাস্টারদের মাইনে বেড়েছে বার কয়েক, কিন্তু পরিমল তবু পড়ে রয়েছে সেইখানে। মাঝে মাঝে গাড়িতে বসেই তাকে তিনি দেখতে পান। আগের মতো চেহারাটা আর তাজা নেই। মুখের লালচে ভাবটা মুছে গিয়েছে। ফুটপাতের ওপব দিয়ে মাথা নিচু করে ঘাড়ে একটা অল্প দামেব শান্-ব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তা চলে সে। মনে হয় চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছে পরিমল। দিনরাত হয়তো মার্ক্সবাদের বই পড়ছে। শান্-ব্যাগটা ভাবী। মোটা মোটা বই, বড় বড় চিন্তা। এক্‌রামুল্লার বিবির সঙ্গে তেবো বছর ধরে ঘব করছে, অথচ ছোড়াটার মুখের ওপর বিপ্লবেব চিহ্ন কিছু নেই। চোখ থেকে আগুনের হল্কা বেরোয় না। পুরু কাঁচের চশমা পরে সে। তেবো বছরে দৃষ্টিশক্তি আরো হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয়। এক্‌রামুল্লার বিবির কাছ থেকে কি যে পেল তিনি তা বুঝতে পারেন না।

রাসবিহারী অ্যাভিনুর ট্রাম লাইনটা পার হয়ে এলেন গোপীমোহন। তিনি বোধহয় পণ্ডিতিয়া রোডের দিকেই পথ ধরলেন। দশ বছর অপেক্ষা করবার পর তিনি ওদের একদিন দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর গত তিন বছর থেকে যাওয়া আসা করছেন। পরিমলকে না দেখে থাকতে পারেন না। প্রথম যৌবনের প্রথম সন্তান বলেই হয়তো পরিমলের প্রতি তাঁর গভীর টান রয়েছে।

সুনন্দার সঙ্গেও ভাব হয়েছে তাঁর। সুনন্দা নামটা তিনি আগে

কখনো মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। পরিমলের সঙ্গে কথা বলবার সময় এক্‌রামুল্লার বিবি বলে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতেন। এখন মাঝে মাঝে বড়-বউমা বলেও সম্বোধন করেন।

প্রথম যেদিন ওদের দেখতে গিয়েছিলেন সেদিনের কথাটা মনে আছে তাঁর। সেই দিনটাও ছিল পয়লা জানুয়ারী। নিউ মার্কেট থেকে পাঁচশ টাকার সওদা কেনবার সময় হঠাৎ পরিমলের কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। তিন বছর আগেকার পয়লা জানুয়ারী ছিল সেটা। ওদের জন্যও নিউ মার্কেট থেকে শতখানিক টাকার জিনিসপত্র কিনেছিলেন। নিয়মটা তিনি আজো রক্ষা করে চলেছেন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পয়লা জানুয়ারীতে উপহার পায়। প্রথম যেদিন ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন, সেদিন চৌকির ওপর বসে খাতা-পেন্সিল নিয়ে পরিমল এক্‌রামুল্লার বিবির সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করছিল। চৌকির এক কোণায় গোটা কয়েক মোটা মোটা বই ছিল। একটা বই মাঝখানে খোলা রয়েছে। লাল আর নীল পেন্সিলের দাগ পড়েছে অনেক জায়গায়। এক্‌রামুল্লার বিবি লম্বা ধরনের একটা বিড়ি ধরিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে তন্ময় হয়ে পরিমলের যুক্তিগুলো শুনে যাচ্ছিল। গোপীমোহনের তক্ষুনি মনে হয়েছিল, বাঙালী মেয়ে যত বড় বিপ্লবীই হোক না কেন, তাদের খাকী ব্র্যাণ্ড মানায় না।

আলোচনার শেষ দুটো লাইনই শুধু শুনতে পেয়েছিলেন গোপীমোহনবাবু। পরিমল বলছিল, 'সেইজন্যই আমরা সোসিও-ইকনমিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই।'

'আমূল পরিবর্তন মানে বিপ্লব।'

বাইরে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলেছিলেন তিনি। উঁকি দিয়ে বউমার বুকের সোসিও ইকনমিক অবস্থাটা গোপীমোহন দেখলেন। শুকিয়ে আমসী হয়ে গিয়েছে। মাঠের মতো সমতল। মেয়েমানুষ বলে

বোঝা যায় না। কোনো সভ্য দেশেই সুনন্দা স্ত্রীলোক বলে নিজের পরিচয় কখনো উদ্‌ঘাটন করতে পারত না। ওব' ওকে যাদুঘরে কাঁচেব খাঁচায় স্পিরিট দিয়ে ভিজিয়ে রাখত।

অথচ একে নিয়েই ঘর করছে পরিমল। বারো বছর আগে একটা ছেলেও হয়েছে। সোসিও-ইকনমিক অবস্থাব রহস্য তিনি বুঝতে পারেন না। লোকের মুখে শুনেছেন যে, ছেলেটা নাকি সত্যি সত্যি বিপ্লবী হয়ে জন্মেছে। বারো বছর বয়সেই বাণ্টু নাকি কলকাতার রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলেছে। এখন তিনি তাকে দেখতে পেলেন না।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বার দুই চাপা কণ্ঠে পবিমলের নাম ধবে ডাকলেন। 'মুখ থেকে বিড়িটা ফেলে দিয়ে সুনন্দা বলল, 'কে যেন ডাকছেন তোমায়—বোধহয় গোপীমোহন বাবু।'

'আমাব বাবা!' গোপীমোহনকে হাতে ধবে ভেতবে নিয়ে গিয়েছিল পরিমল। স্পর্শ টা ভাল লেগেছিল তাঁর। প্রথম সন্তান বলেই হয়তো পরিমলের ওপর দুবলতার সীমা নেই। ছোট ছেলে সত্যপ্রকাশের প্রতি এতোটা আকর্ষণ তিনি অনুভব কবেন না। তাঁকে তো তিনি চব্বিশ ঘন্টাই চোখের ওপর দেখছেন। তবু মনে হয়, চব্বিশ বছব না দেখলেও সত্যপ্রকাশের জন্য তিনি কলকাতার অলিতে গলিতে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেন না। মায়ের খুব প্রিয় ছিল সতু। তিনিই ওর নাম রেখেছিলেন সত্যপ্রকাশ। তিনিই ওর বাবোটা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। প্রতি পদে পদে সত্য মেনে চলে। সেই কারণে কলকাতার পথেঘাটে শুধু হোঁচট খায়। এই বাজারে শুধু সত্য প্রকাশ করতে করতে পথ চললে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠবে। সতু সে সব বোঝে না। সে তার নিজের তালে, নিজের ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে। পঁচিশ বছর বয়স। চাকরি-বাকরি করবার ইচ্ছা নেই। বলে 'পৃথিবীর যা অবস্থা হয়েছে বাবা, তাতে কোনো চাকরিই স্থায়ী নয়।'

গোপীমোহন বলেছিলেন, 'তবু মরবার আগে তোকে আমি একটা পাকা কাজকর্মের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে যেতে চাই। তোকে বেকার রেখে যাই কি করে সতু?'

'সময় হলেই তুমি চলে যেও, আমি বাধা দিলেও যমরাজা মানবেন না। তোমাকে যেতেই হবে। আমি যা করছি, তাই করব।'

'কি করছিস?'

'কবিতা লিখছি।'

মা ওর বেঁচে নেই, নইলে সতুকে জুতো মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার করে দিতেন। মমতার ওপর খুবই রাগ হয়েছিল তাঁর। এমন একটি সুন্দর ঐতিহাসিক গর্ভ থেকে একটি কমিউনিস্ট আর একটি কবির জন্ম দিয়ে গিয়েছে সে। নিজে তো হ্রদের জলে ডুবে গিয়ে রক্ষা পেয়ে গেল। এখন শুধু তাঁকেই ইতিহাসের দু-দুটো বড় বড় বোঝা বহন করতে হচ্ছে। কথাটা ভাবতে গেলেই তাঁর খুনের নেশা চেপে যায়। গোড়াতেই যদি টের পেতেন যে এরা কবি আর কমিউনিস্ট হবে, তা হলে লাখ লাখ টাকা তিনি ঘুষ খেতেন না। উত্তরাধিকারীরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে বলেই তো তিনি ঘুষ খেয়েছিলেন। পেনশনের টাকা দিয়ে তাঁর নিজের জীবনটা অনায়াসেই কেটে যেতে পারত।

গাড়ি চালাতে চালাতে প্রথম সাক্ষাতের দিনটার কথাই ভাবছিলেন গোপীমোহন। সুনন্দা বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিল তাঁর। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীলতার পায়ে মাথা তুমি নত করো না, বউমা।'

'তবু আপনার চরণধূলার প্রতি শ্রদ্ধা আমায় দেখাতেই হবে। এর দ্বারা কেউ নিপীড়িত কিংবা শোষিত হবে না। সমাজ ব্যবস্থা থেকে আমরা পীড়ন আর শোষণ দুটোই তুলে দিতে চাই।'

'আমি আপত্তি করলেই তো তোমরা তর্ক করতে থাকবে—"
একটা হাতল-হীন চেয়ারে বসে পড়ে গোপীমোহনই বলেছিলেন, 'আজ পয়লা জানুয়ারী, উনিশশো চৌষট্টি শুরু হল। দুঃখের বিষয় পৃথিবীর প্রথম পয়লা জানুয়ারীতেও মানুষ মানুষকে পীড়ন আর শোষণ করেছিল। এটা হচ্ছে গিয়ে মানুষের সহজাত ধর্ম। কমবেশি পীড়ন আর শোষণ সব সময়েই থাকবে। সৃষ্টির মূলে যন্ত্রণা রয়েছে, বৃদ্ধির মূলেও লাঞ্ছনা থাকবে। নইলে সৃষ্টি কিংবা বৃদ্ধি কোনোটাই হবে না। বউমা, শুনেছি বারো বছর আগে তোমাদের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেটি কোথায় ?

'বাড়ি নেই। এই সময়ে বাণ্টু কোনোদিনই বাড়ি থাকে না।'

'কি করে? ইস্কুলে যায় বুঝি? কোন্ ইস্কুলে প্রবেশ করেছে ?

'মার্ক্সবাদের।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো। সে তো শুনেছি মাতৃগর্ভ থেকেই লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।'

পরিমল এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে বলল, গুজবটা পুরোপুরি মিথ্যে নয় বাবা। আমাদের জীবনে ষোল আনা বিপ্লবী হওয়া আর সম্ভব নয়। আমাদের অভাবটা পূরণ করবে বাণ্টু। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা স্বশ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কার থেকে পুরোপুরি চ্যুত হতে পারিনি—বাণ্টু গোড়া থেকেই ডী-ক্লাসড্. শ্রেণীহীন নরশিশু।'

'গোপীমোহন সিংহের এর চেয়ে ভাল ওয়ারীশ আমি কল্পনাই করতে পারি না। তাকে আমি দেখতে চাই। আদর করতে চাই। ওর প্রতিটি রোমকূপের মুখে বিপ্লবের বারুদ ঠাসা আছে জানি। কিন্তু আমার স্নেহভালবাসা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে চাই না আমি। গাড়ীতে একটা ঝুড়ি রয়েছে। সেটা কি তুই বহন করে নিয়ে আসতে পারবি পরিমল ?'

'ওজন কতো ?' জিজ্ঞাসা করল সুনন্দা।

'মণখানেক তো হবেই।' মুচকি হেসে জবাব দিলেন গোপী-মোহন।

'তা হলে পরিমল ওটা বহন করতে পারবে না। দু'মাস আগে পরিমল হার্টের অসুখ থেকে ভুগে উঠেছে।'

'বলো কি, বউমা ? এটা কত নম্বর আক্রমণ ?'

'প্রথম।'

'তাহলে খুবই সাবধানে থাকতে হবে ওকে। মার্ক্সবাদীর হার্টের ওপর আক্রমণ হতে পারবে না সেটা তো কোনো যুক্তি নয়, বউমা। একটা কুলী ধরে নিয়ে আয় পরিমল। সে ঝুড়িটাকে পৌঁছে দিয়ে যাক। চল, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। আহা বেচারী! মুখ দেখে আগেই আমি বুঝেছিলাম ওর ওপর বিরাট একটা আক্রমণ কেউ চালিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে হার্ট অ্যাটাক তা আমি বুঝতে পারিনি। কুলী ডাকবারও দরকার নেই, বউমা। একমণ বোঝা আমি নিজেই বহন করে নিয়ে আসতে পারব।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মৃদু হেসে গোপীমোহন বলেছিলেন, 'আমার এখন সাতান্ন চলছে।'

সেই দিন থেকে গত তিন বছর ধরে প্রায়ই তিনি এখানে আসেন। সুনন্দা তাঁকে টানে। মেয়েটির চরিত্র যে অদ্ভুত সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা দেশের কয়েক কোটি মেয়েদের চরিত্র থেকে একেবারে আলাদা। ষোল থেকে সাঁইত্রিশ বছরের মেয়েদের সঙ্গে আজো তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। মমতার মৃত্যুর পর একটা দিনও তিনি স্ত্রীলোক ছাড়া জীবনযাপন করতে পারেন নি। অনেক দেখেছেন, অনেক ভোগ করেছেন। কলকাতার কোনো সমাজের স্ত্রীলোক দেখা তাঁর বাকী নেই। তারপর গল্প উপন্যাসও পড়েন। সকলকেই যেন ফ্ল্যাট মনে হয়। চড়াই উৎরাই নেই। দশখানা উপন্যাস পড়লে যেন আরো হাজারখানা পড়া হয়ে গেল।

কিন্তু একরামুল্লার বিবি একেবারে আলাদা। এমন একটি চরিত্র যে কলকাতায় থাকতে পারে তেমন কথা কল্পনা করাও অসম্ভব।

ছেষট্টির শেষ তারিখ আজ। দেয়ালে দেয়ালে ভোটযুদ্ধের পোস্টার পড়েছে। পণ্ডিতিয়া রোডে ঢুকবার মুখে ডান দিকে একটা তেলের কল। অন্নপূর্ণা অয়েল মিল। বছর দুই আগে এখানকার সরষের তেল খেয়ে বান্টু ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। প্রথম ক'দিন পণ্ডিতিয়া রোডের ডাক্তার কুণ্ডু ভিজিট নিয়ে গেলেন, কিন্তু চিকিৎসা করলেন না। রোগ যখন মারাত্মক হয়ে উঠল তখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন গোপীমোহন। বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন তিনি। নিজের পকেট থেকে ভিজিট দিলেন এবং ওষুধও কিনলেন।

না কিনলে পরিমল কিংবা সুনন্দা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনত না। ওদের পথ ওরা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। পিতার সাহায্য কিংবা পরামর্শ গ্রহণ করে নি। অতএব বত্রিশ টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তারকে বার কয়েক ডেকে না আনলেও ওরা রাগ করত না।

ডেকে এনেছিলেন বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি কেউ। তবু পণ্ডিতিয়া রোডে এসে সুনন্দার কথা শুনতে ভাল লাগে তাঁর। আসবার সময় দু প্যাকেট ভাল ব্র্যাণ্ডের সিগারেট কিনে নিয়ে আসেন। একটা সুনন্দাকে দিয়ে বলেন, 'এটা যতক্ষণ শেষ না করছ ততক্ষণ কথা শুনব তোমার।'

বড়-বউমাকে ভাল লাগে গোপীমোহনের। কী অদ্ভুত একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে। প্রায় আশি পাউণ্ড ওজনের একটি তাজা বোমা। কলকাতার পথেঘাটে মাঝে মাঝে তাকে তিনি দেখতে পান। সেদিন দুপুরবেলা কোন্ এক মন্ত্রীর সঙ্গে আড্ডা মারবার জন্য রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন যে, একটা মিছিল ধীর পদক্ষেপে বিধান সভার দিকে পথ ধরেছে। প্রথম সারিতে সুনন্দার ছেলে বান্টু। তার হাতে একটা ধুলিম্লান

লাল ঝাণ্ডা। বছর বারো বয়স। দাছুর মতোই গাট্টাগোট্টা হয়েছে। অন্নপূর্ণা অয়েল মিলের তেল খেয়ে বাণ্টু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে নি। ওর ডান পা-টা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে রইল। এখন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বিধান সভার দিকে এগিয়ে চলেছে। শ্লোগান দিচ্ছে : ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিছিলটার পাশ দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে বত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়িটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দোতলা বাসের মতো দেখতে। স্টিয়ারিং ধরে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিলেন যে, বাণ্টু যদি কোনো রকম ভাবে গাড়িটার সামনে এসে ছিটকে পড়ে! বত্রিশ সালের গাড়ির ওজনটা আজকালকার গাড়ির মতো হাল্কা নয়। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো ভারী। কথাটা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তিনি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

সুনন্দার আর কোনো দিনও সন্তান হবে না। মমতাব মৃত্যুর পর দ্বিতীয় হত্যার প্রতি টান অনুভব কবেন গোপীমোহন।

মিছিলটা পার হয়ে যাওয়ার পর চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল তাঁর। হত্যার সীমানা থেকে গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। বাণ্টুর পা-টা আর কোনোদিনও ভাল হবে না। গণ-রাজ্যেও বাণ্টুরা চিরদিনই খোঁড়া হয়ে থাকবে।

বালিগঞ্জে ফিরে আসবার জন্য সেদিন তিনি গাড়িটা ঘুবিয়ে নিয়েছিলেন। আড্ডা মারবার মতো মনটা আর হাল্কা ছিল না। সংসারের চতুর্দিকেই পাপ। শুধু একটা পাপকে থেঁতলে দিলেই সমস্যার সমাধান হতো না। পার্ক স্ট্রীট আব ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে এসে গাড়িটা থেমে গিয়েছিল।

এপার-ওপার দু'পারেই লাল আলো জ্বলছিল।

ছেষট্টি সালের শেষ দিন আজ। নিউ মার্কেটে চলেছেন সওদা কিনতে। কাল সকালে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহারগুলো পৌঁছে দিতে হবে। তারপর পরিমলের সংসারের জন্য মাছ, মাংস আর সব্জি কিনবেন। ওদের আদর্শের মূলে যে প্রোটিনের সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় তা তিনি জানেন। সেই জন্যই পরিমল আর সুনন্দাকে ভাল লাগে তাঁর; বাস্তবকে কখনো এড়িয়ে চলে না।

পার্ক স্ট্রীট ধরেই তিনি নিউ মার্কেটে যাচ্ছিলেন। মোড়ের মাথায় এসে গাড়ির এঞ্জিনটা গেল বন্ধ হয়ে। তাতে গোপীমোহন বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। প্রতিদিনই একবার দুবার এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার জন্য লোকও পাওয়া যায়।

আজ একটু মুশকিলে পড়ে গেলেন। পেছন দিকে গাড়ির একটা লাইন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সকলেই একসঙ্গে হর্ন বাজিয়ে চলেছে। নানা রকম ভাষায় গালাগালিও করছে। পেছন ফিরে দৃষ্টি দিতে গিয়ে ছেষট্টি সালের ক্যালেণ্ডারের ছবিটা চোখে পড়ল তাঁর। গদির ওপর পড়ে রয়েছে। নারী বিবস্ত্রা, দুই হাঁটুর মাঝখানে তানপুরা, পশ্চাৎদিকে ভারতবর্ষের মানচিত্র। গাড়িটা তবু স্টার্ট নিচ্ছে না। ছবিটা বাঁধাবার জন্যই নিয়ে এসেছিলেন। একটি ছোকরা সার্জেন্ট এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। স্বাধীনোত্তর কলকাতার এম. এ. পাশ বাঙালী সার্জেন্ট। সহানুভূতির সুরে বলল সে, 'আপনি বসে থাকুন। আমি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি ওপারে।'

একটি সেপাই এসে পেছন থেকে ঠেলতে লাগল বত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়ি। 'না না, আমি নামছি। আমিও ঠেলব। আমার অভ্যাস আছে।'

বললেন গোপীমোহন।

'আপনি বসুন।'

প্রতিবাদ করবার কিংবা নামবার আগেই তিনি দেখলেন, মোড়টা পার হয়ে এসেছেন। ওরা ঠেলতে ঠেলতে মস্তবড় একটা ম্যানশনের সামনে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সার্জেণ্ট মিত্র মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কোন্ সালের গাড়ি?'

'উনিশশো বত্রিশ সাল।'

'আমি তখনো জন্মাইনি।'

গাড়িটার জন্য কোনোদিনও গোপীমোহন অপ্রস্তুত বোধ করেন নি, আজ এই ছোকরা সার্জেণ্টটির সামনে কেমন যেন ছোট হয়ে গেলেন তিনি। মনে মনে জানেন তিনি ধনীলোক। গভর্নমেণ্টের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে ভাঙা গাড়ি চালাতে হয় তাঁকে। খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে গোপীমোহন বললেন, 'এবার এটাকে বেচে দেব।'

'আমরা তাহলে আপনাকে পূর্ণ দাস রোডের বারোয়ারী প্যাণ্ডেলে নিয়ে গিয়ে ধুমধাম করে অভিনন্দন জানাব।'

'আমার অপরাধ?'

'আপনার পাশের বাড়িতে আমি থাকি। আপনি যখন ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ করতে করতে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরেন আমাদের তখন মধ্যরাত্রির পাকা ঘুমটা ভেঙে যায়। বেচলে কত দামে বেচবেন?'

'পাঁচশ পেলে ছেড়ে দেব—ক্যাশ ডাউন চাই।'

'আড়াইশ হলে নিতে পারি—দেবেন?'

গাড়ি থেকে নেমে গাড়িতে হ্যাণ্ডেল চালিয়ে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে গোপীমোহন বললেন, 'মল্লিক বাজারে ঝেড়ে দিয়ে এলেও আড়াইশ টাকা পেতে পারি।'

'আমিও তো মল্লিক বাজারের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে এর সৎকারের কথা ভাবছিলাম। হয়তো দু'শ টাকার বেশি পাব না। তা হোক, পঞ্চাশ টাকা লোকসান হলেও বাবা রাগ করবেন না। ব্লাড

প্রেসারের রোগী তিনি। একবার ঘুম ভেঙে গেলে তাঁর আর ঘুম আসে না।' সশব্দে হেসে উঠে সার্জেণ্ট মিত্র অনুনয়ের সুরে বলল, 'ডিল্‌টা ক্লোজ করে দিন। দুপুরবেলা বাড়ি গিয়ে বাবাকে এই সুখবরটা দিতে পারব। তাঁকে গিয়ে বলতে পারব, কলকাতার রাজপথ থেকে খানিকটা নোংরা সাফ করে দিয়ে এসেছি...'

'তোমার মতো সৎ সার্জেণ্টের কোনোদিন উন্নতি হবে না। চলি ভাই।'

'আড়াইশো-তে গাড়িটা দেবেন না?' ঝুঁকে দাঁড়াল সার্জেণ্ট।

'স্টার্ট নিয়েছে। এখন সাড়ে সাতশো চাই।'

নারীদেহের ওপর হাত রাখবার ভঙ্গী করে ষ্টিয়ারিংটার ওপর অত্যন্ত সযত্নে মোচড় দিলেন একটা। তারপর মন্থর গতিতে আবার তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন নিউ মার্কেটের দিকে। সন্দেহ হল, কে যেন গাড়িটার কারবিউরেটরে জল ঢুকিয়ে রেখেছে। গতকাল সন্ধ্যার পর সুনন্দার ওখানে গিয়েছিলেন। দুষ্টুমি করে শ্রীমান বাণ্টু এ কাজটি করে রাখে নি তো? সুনন্দা বলে, 'সুখ হচ্ছে গিয়ে পুনর্নির্মাণ করা কারবিউরেটর। সবার ভাগ্যে নতুন কারবিউরেটর জোটে না। মেরামত করে চালিয়ে নিতে হয়।'

চৌরঙ্গীর রাস্তাটা পার হয়ে ওপাশে চলে গেলেন গোপীমোহন মাঠের ধারে গাড়ি লাগিয়ে যন্ত্রটা একটু পরীক্ষা করে দেখতে চান। বাণ্টুকে বিশ্বাস নেই। সম্পর্কে নাতি হলেও সে হচ্ছে গিয়ে গোপীমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষ। বাণ্টু খোঁড়া হলে কী হবে পরিমলদের ইতিহাস ওর মধ্যেই প্রগতি দেখতে পাচ্ছে।

মাঠের ধারে গাছতলায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিয়ে কারবিউরেটর খুলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি ইংরেজ যুবতী খুবই কাছে এগিয়ে এল তাঁর। মেয়েটি গলফ খেলতে এসেছে। ঠেলা মেরে চশমাটা ওপর দিকে তুলে দিয়ে গোলাকৃতি বলের দিক নির্ণয় করতে গিয়ে মেয়েটির পোশাকের দিকে দৃষ্টি ফেললেন তিনি। জাঙ্গিয়ার

মতো ছোট মাপের একটা হাফপ্যান্ট পরেছে মেয়েটি। হাঁটুর ওপর থেকে উরুর দুই তৃতীয়াংশ উন্মুক্ত। উরুর মাংসে হাফপ্যান্টের কোণাটা বসে গিয়েছে। কুলু ভ্যালীর আধপাকা আপেলের গোলাপী আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে মাংস থেকে। সাদা বলটি ঠোকা খেয়ে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে কে জানে। বল কিংবা কারবিউরেটর কোনো দিকেই দৃষ্টি নেই তার। গভীর মনোযোগ দিয়ে গোলাপী আভা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন গোপীবাবু।

সারা জীবন ধরেই এমন জিনিস দেখছেন তিনি। কিন্তু সূর্যালোকিত ময়দানে মাত্র হাত পাঁচেক দূর থেকে যুবতী নারীর উরু দেখবার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। ম্যানশনের নিভৃত কক্ষে যা দেখেন তার পুরো অংশটাই টাকা দিয়ে কেনা।

কারবিউরেটরটা যেমন ছিল তেমনি রইল। গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি। হ্যাণ্ডেল দিয়ে আড়াই প্যাঁচ মারতেই এঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে। উরু আর নিতম্বের সুডৌল মাংসখণ্ডগুলি ময়দানের সোনালী আলোয় রঙবেরঙের প্রজাপতির মতো তাঁর চোখের সামনে ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। মেয়েটি এখন চলে গিয়েছে দূরে। তবু চোখ বুঁজেও দৃশ্যটা উপভোগ করেছিলেন তিনি। এমন সময় একটা সেপাই এসে তাঁকে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি করছেন বাবু?'

'আরে নিতাই যে। এদিকেই ডিউটি ছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর দুঘণ্টা বাকী।'

'কিছু হল টল?'

'আজ্ঞে বিশেষ কিছু না। দিনের বেলা মাঠ-ময়দানে কেউ তো অবৈধ কাজকর্ম করতে আসে না।'

'শীতের সকালে দেহ ঠাণ্ডা থাকে।'

'একটা হকার দয়া করে একটা আধুলি দিয়েছে। বলেছি অন্য একদিন পুষিয়ে দেব। একেবারে শূন্য হাতে ফিরি কি করে।'

গোপীমোহন সেপাইটিকে চেনেন। পূর্ববঙ্গের রিফিউজী। ওর ছোট ভাইকে তিনিই চেষ্টা করে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার পাইয়ে দিয়েছিলেন। এরা একসঙ্গে আড়াইশো টাকাও দেখেনি।

গোপীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাইয়ের ব্যবসা কেমন চলছে? কি যেন নামটা তার?'

'সমীর।'

'গভর্নমেণ্টকে যতই দোষ দাও, পাঁচ হাজার টাকা হাতে পেলে যে-কোনো অবাঙালী একটা ভাল ব্যবসা খুলে বসতে পারত।'

'আজ্ঞে আপনি তো জানেন না। সমীর হাতে পেয়েছিল মাত্র আড়াই হাজার টাকা। ধারের টাকাতেও পঞ্চাশ পারসেণ্ট কমিশন দিতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আড়াই হাজার দিয়ে ডিমের কারবার খুলেছিল সমীর। দোকান দিয়ে ছিল একটা। মুর্শিদাবাদ আর রাঁচী থেকে ডিমের চালান আনত। গোটা কয়েক চালান আসার পর পুরো ডিপার্টমেণ্টের বাবুরাই বাকীতে ডিম কিনতে লাগলেন। সেই টিকিওয়ালা বিখ্যাত হেডক্লার্ক বাবুও ঠোঙায় করে মুরগির ডিম বাড়ি নিয়ে যেতে লাগলেন। বলতো যে ছেলেপিলেরা হাঁসের ডিম খেতে পারে না। শেষ পর্যন্ত চোদ্দ আনাই বাকী পড়ে গেল। নিরুপায় হয়ে সমীর ফিরে গেল পাকিস্তানে। শুনেছি সেখানে গিয়ে উন্নতি করেছে খুব। বড় ব্যবসা চালাচ্ছে। ধর্ম পাল্টে সমীর এখন ছমীরুদ্দীন হয়েছে।'

'উন্নতি করবার জন্য মানুষকে কখন যে কি করতে হয় বলা বড় মুশকিল। খারাপ কিছু করে নি সমীর। একজন শুধু হিন্দু কমে গেল। সংখ্যা বাড়িয়েই বা লাভ কি বলো? একজন কমে গেল বলেও তো এই দেশে এখনো চল্লিশ কোটির বেশি রয়েছে। তাদের দিয়ে কি কাজ হচ্ছে? আধখানা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও

তো ষোল আনা কার্যকরী হল না।—যাই এবার। আবার দেখা হবে।'

চৌরঙ্গীর দিকে চলে এলেন তিনি। কিন্তু বড় রাস্তাটায় পড়তে পারলেন না। লাল আলো জ্বলে উঠল। এঞ্জিনটা থেকে আওয়াজ হতে লাগল। আশপাশের নতুন গাড়িগুলির সওয়ারীরা তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এই ধরনের একটা গাড়ি যে তিনি চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়েও চালিয়ে যাওয়ার সাহস রাখেন সেই কথা ভেবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর সুখ্যাতি করছে।

সামনের রেখা-টানা জায়গাটুকুর মধ্যে দিয়ে লোক চলাচল করছে। রাস্তা পার হচ্ছে তারা। গোপীমোহন দেখলেন, ডান দিক থেকে সত্যপ্রকাশও চিন্তামগ্ন অবস্থায় রাস্তাটা পার হওয়ার চেষ্টা করছে। ছোঁড়াটাকে ফ্যাসাদে ফেলে গিয়েছেন ওর মা। নামের জন্যই যেন এ যুগের সঙ্গে একেবারেই খাপ খাচ্ছে না। সত্যের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথেই সে পা দেবে না। ধুতি পরে, পাঞ্জাবী ঝোলায়। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। বি.এ. পাশ করবার পর আর পড়তে চাইল না। লেখাপড়ায় খুবই ভাল। এম. এ. পড়বার জন্য অনেক সাধাসাধি করেছিলেন তিনি। অনাবশ্যক সময় আর টাকা নষ্ট করতে চায় নি সে। শুধু বলত, 'মনপ্রাণ ডুবিয়ে দিয়ে অধ্যয়ন করবার মতো ভারতবর্ষে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। সব জায়গাতেই শুধু চেঁচামেচি, শুধু হৈ-হল্লা। বাবা, ভারতবর্ষের কোনো গুহাতে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান পাও আমাকে বলো।' পাগল আর কাকে বলে! এমন ছোকরা কবি হবে না তো হবে কি? কমিউনিস্ট ছেলেকে সহ্য করতে পারেন, কিন্তু কবি ছেলেকে সহ্য করতে পারেন না। কি করে যে বংশরক্ষা হবে ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন গোপীমোহন। এক-একবার ভাবেন, বাড়িঘর বেচে ভারত-বর্ষের জঙ্গলে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। অজ্ঞাতবাসে বাস করাই তাঁর উচিত। বাণ্টুর দাদু হিসেবে কলকাতার সমাজে

তিনি পরিচিত হতে চান না। আত্মীয়-স্বজনরা যখন জিজ্ঞাসা করে ছেলে দুটি করছে কি—তখন তিনি জবাব দিতে লজ্জা বোধ করেন। এর চেয়ে ভারতবর্ষের অরণ্যে গিয়ে অজ্ঞাতবাসে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া কি ভাল নয়?

গাড়িটা একটু এগিয়ে যেতে বনেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সত্যপ্রকাশ। নাকি সত্যপ্রকাশকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন গোপীমোহন? মমতার কোনো চিহ্নই কি তিনি রাখতে চান না? পরিমলের হার্টের অসুখ। যে কোনো দিন টেঁশে যেতে পারে। বাণ্টুকে তিনি স্বীকার করবেন না। বাকী থাকবে শুধু সতু।

বাইরের দিকে মুখ বার করে গোপীমোহন বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে আয়। বছরের শেষ দিনটিতে চিন্তামগ্ন হয়ে কোথায় চলেছিস?'

পেছনের সীটে উঠে বসল সত্যপ্রকাশ। মোড়টা পার হয়ে এসে গোপীমোহন বললেন, 'ওরকম হ্যালাক্ষ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কোনো গন্তব্যেই পৌঁছতে পারবি না।'

'গন্তব্যে পৌঁছতে চাইছি তা তোমায় বলল কে?'

'তবে কি করবি? মাঝখানে ঝুলে থাকবি? এই রে, ক্যালেণ্ডারের ছবিটার বারোটা বাজিয়ে দিলি তো? ওটার ওপর চেপে বসেছিস তো? ওটা বাঁধাতে নিয়ে যাচ্ছি। ছেষট্টি শেষ হচ্ছে।'

কাত হয়ে বসে ছবিটা টেনে বার করে সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'একি বাবা, ন্যাংটো ছবিটা কাগজ দিয়ে মুড়ে আনোনি কেন?'

'ওসব নিষিদ্ধ ফল সম্বন্ধে তোর প্রশ্ন করার দরকার নেই। কাল বাড়ি ফিরিস নি কেন? কোথায় ছিলি?'

'বড়-বউদির ওখানে। আচ্ছা বাবা, তোমার নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা? সত্যি নাকি?'

'তা হলে কি আর বত্রিশ সনের ফোর্ড গাড়ি চালাচ্ছি।'

'বহু টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছ তুমি। অনেক রকমের কথাই শুনতে পাচ্ছি। দেওয়ালে বটগাছ পুঁতেছ কেন? অবিশ্বাস করবার মতো দু-একটা যুক্তি দেখাও, বাবা।'

'এই তো সবে আলোচনা শুরু হল…হ্যাঁরে, এসব কি বড়-বউমা তোকে বলেছে?'

'পাগল! বৌদি ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামান না।'

'সুনন্দা তোকে হাত করছে। সাবধান কবি!'

'কি উদ্দেশ্যে?'

'সে জানে আমার নগদ টাকা আর বিষয-সম্পত্তি কমিউনিস্ট-সন্তান পাবে না। সব তুই পাবি।'

'কবি-সন্তানই বা এতো টাকাপয়সা আব বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কি করবে? তার চেয়ে বরং গভর্নমেণ্টেব পাওনা টাকা সব ফিবিয়ে দাও। তোমাকে শুধু একজন বায়োলজিকেল পিতা বলে ভাবতে চাই না। তোমাকে শ্রদ্ধা কবতে চাই। কোথায় চললে, বাবা?'

'নিউ মার্কেটে।'

'তাহলে খুব ভাল হল। দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। বাণ্টু একটা আস্ত পাঁঠা কিনে নিয়ে যেতে বলেছে। নববর্ষে সেটাকে কেটে ফেলবে।'

'তুমি যা আমায় হাতখবচ দাও তাতে আধখানা পাঁঠা কেনা যেতে পারে। বাবা, নিউ মার্কেট থেকে আমায় একটা আস্ত পাঁঠা কিনে দেবে?'

'বলি দেওয়ার জায়গা পাবি কোথায়?'

'বস্তিতে জায়গা পাওয়া যাবে। বাণ্টু বলল, এক কোপে কেটে ফেলব, কাকু। জ্যান্ত পাঁঠা কিনলে নাকি পাঁচ-দশ টাকা কম পড়বে। হাজরা লেনের মুচিবা বলেছে, ছালটা নাকি নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে। একটা পাঁঠা কিনে নিয়ে চলো, বাবা।'

'গাড়ি করে একসঙ্গে আমি ছুটো পাঁঠা নিয়ে যেতে পারব না, সতু। তুই বরং এখানে নেমে যা।'

'তাই ভাল। আমি একবার রতিলালের বাড়ি যাব। আমার সেই মাড়োয়ারী বন্ধুটির সঙ্গে তুমি একদিনও আলাপ করলে না। আমার ছু ক্লাস ওপরে পড়ত। কোটিপতি। হঠাৎ ছু বছর আগে বাবা মারা গেলেন বলে রতিলালকে সকল কাজের ভার নিতে হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা। বছরের মধ্যে শুধু ছ মাস আজকাল ভারতবর্ষে থাকে। বউয়ের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়—'

নিজের মনেই হেসে উঠল সত্যপ্রকাশ।

গোপীমোহন নিউ মার্কেটের পাশে গাড়িটা দাঁড় করালেন। টুথব্রাশের মতো গোঁফটা ক্রমাগত নড়ছিল। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। সত্যপ্রকাশ যখন হেসে হেসে কথা বলে তখনি ওকে ভয় করে।

সত্যপ্রকাশ গাড়ি থেকে নেমে গোপীমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল। তার কনুইয়ের সঙ্গে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা, কাল বউদিরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন তখন আমি একটা নতুন কবিতা লিখে ফেললাম—'

'কোথায় বসে লিখলি? ঘর তো একটা।'

'দাদা, বউদি আর বাণ্টু চৌকিব ওপর শুয়েছিলেন। আমি শুয়েছিলাম মেঝের ওপব মাতুর বিছিয়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে একটা লম্বা কবিতা লিখে ফেলতে কষ্ট হল না।'

'বুকে সর্দি বসে যাবে, সতু। মেঝেতে তো সিমেণ্ট নেই, উপুড় হয়ে শুয়ে আব কোনোদিন কবিতা লিখো না। কাল তোমার মস্তবড় একটা ফাঁড়া গিয়েছে—মৃত্যুযোগ কাটিয়ে উঠেছ। সবে যা, আমি এবার নামব।'

'কবিতা শুনে যাও বাবা।'

'আমার এখন সময় নেই।'

'শুধু দু মিনিট—'

পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটা কাগজ বার করে সত্যপ্রকাশ পড়তে লাগল :

'দুর্ভাগ্য ছিল আমার ভগবান।
ক্লেদেতে আমি হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছি,
আর গা শুকিয়েছি দুষ্কর্মের হাওয়ায়।
বাতুলতাকে বেদম জব্দ করেছি বেশ কয়েক বাব।
আর বসন্ত আমাকে দান করেছে
জড়মূর্খেব ভয়ংকর হাসি…. '

বনেটের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে লম্বা কবিতাটা যখন পড়া শেষ করল সতু, গোপীমোহন তখন সেখানে ছিলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিউ মার্কেট ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনতে লাগলেন গোপীমোহন। দুটো কুলী তিনি নিয়োগ করেছেন। ছ-সাতশো টাকার জিনিস কিনতে হবে। তা ছাড়া একটা জ্যান্ত পাঁঠাও কিনে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। কথা বলতে বলতে সতু হেসে ওঠে বটে কিন্তু হাসির কথা ওগুলো নয়। প্রকৃতপক্ষে যে সব কথার মধ্যে হাসি মিশ্রিত থাকে সেগুলোই মারাত্মক। পাঁঠা কেনবার কথাটাও হাসতে হাসতে বলে ফেলেছিল সতু। সুতরাং বছরের শেষ দিনটাতে তাঁকে একটা জ্যান্ত পাঁঠা কিনতে হবে। বাণ্টু বলেছে, হাজরা লেনের মুচিরা এসে ছালটা কিনে নিয়ে যাবে। পাঁঠার ছাল ছাড়াতে কষ্ট হয় না, কিন্তু মানুষের ছাল ছাড়াতে গেলে নৃশংসতার পরিচয় দেওয়া হয়। বাণ্টুর হাতে যদি কোনোদিন শাসনভার ন্যস্ত হয় তাহলে প্রথমেই কি সে তার জ্যান্ত দাদুর গা থেকে নিজের হাতে ছালটা ছাড়িয়ে নেবে না?

হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজের গায়ের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে ছালের মসৃণতা অনুভব করতে লাগলেন। এই বয়সেও চামড়ার ওপর ভাজ পড়ে নি। ছাল ছাড়াতে আরাম পাবে বাণ্টু।

'আরে বউমা যে! তুমি এখানে?'

'বাণ্টু ধরেছে নিউ মার্কেটের মাংস খাবে। ছোলা-খাওয়া ভেড়ার মাংস—'হঠাৎ কথা বন্ধ করে কি যেন তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল সুনন্দা।

গোপীবাবু বুঝতে পারলেন, পাশের দোকানটার শো-কেসে সাজানো কয়েকটা শাড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে পরিমলের বউ। মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'বল তো সবচেয়ে সুন্দর শাড়িখানা কিনে দিই—কমিউনিস্ট মেয়েদের ভাল শাড়ি পরতে নেই তেমন কথা কোন্ বইতে লেখা আছে বৌমা?

'আমরা সব সময়েই বইয়ের লাইন মিলিয়ে মিলিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি তাই বা আপনি ভেবে নিলেন কি করে?'

'না, না—এই নাও, সিগারেটের প্যাকেটটা সঙ্গে রাখো। নাকি একটা এখন ধরাবে?'

গোপীমোহন বউমার সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজের সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে সুনন্দার হাতের জীর্ণশীর্ণ আঙ্গুল-গুলো দেখতে লাগলেন তিনি। এই বয়সে চামড়া শুধু ঢিলে হয় নি, ঝলসানো মাটির মতো বিবর্ণ হয়েও গিয়েছে। আঙ্গুলের গাঁটগুলো ছোট ছোট সুপুরির মতো ফোলা ফোলা। আঙুলের ডগায় হলদে রঙের নিকোটিনের বিষ। ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মধ্যে তর্জনীটাই সবচেয়ে কুৎসিত। মনে হয় অগ্রভাগে দরজিদের মতো কালো রঙের টুপি বসানো। ঘষা লেগে লেগে কালো রঙটাও একটু ফিকে হয়ে এসেছে। নখটা নেই বলে ফাঁকা জায়গাটুকু নিকোটিনের বিষ দিয়ে ভর্তি।

তর্জনীটা গভীর মনোযোগ দিয়ে গোপীমোহন লক্ষ্য করছেন দেখে সুনন্দা বলল, 'এটার ওপরেই সবচেয়ে বেশী অত্যাচার হয়েছিল। রাত জেগে জেগে পাঠান পুলিস ছুঁচ ফোটাত আর ইলেকট্রিক শক্ লাগাত। রাতের পর রাত… …বলত, দলের লোক-দের নাম বলে দাও।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুনন্দাই বলল, একটা বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের দাগ রয়েছে এখানে।'

'শুনতে ইচ্ছে করে—' বিদ্রুপের সুরটা চেপে রেখে সমবেদনার সুরে গোপীমোহন বললেন, 'একদিন শুনব।'

'কি করবেন শুনে? যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখছেন তাঁদের কমিটির মধ্যে তো আপনি নেই।'

সুনন্দার কাছে হেরে গেলেন ভেবে গোপীমোহন মধুর হাসি ফুটিয়ে প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে বললেন, 'ছেষট্টি শেষ হচ্ছে। ভিড় দেখেছ? মনে দোলা লাগে, বউমা। আগে কখনো মধ্যবিত্তরা এখানে বাজার করতে আসত না। আজকাল আসে। তাদের ভিড় দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাই। এ সবই বিশ্ব-নেতা জহরলাল নেহেরুর কীর্তি আর পরিকল্পনার ফল। তোমার কি মনে হয় বউমা?'

'মুদ্রাস্ফীতি।' সিগারেট ফুঁকতে লাগল সুনন্দা।

'তা হোক। যুগের যা নিয়ম তাই মেনেই চলতে হবে। আমিও চেয়েছিলাম পরিমল বণিক-অফিসে কভেনেনটেড অফিসাব হোক কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। বাপ হিসেবে আমি চেয়েছিলাম, সন্তান ছুটি প্রতিদিন স্ফীত হয়ে উঠুক। কলকাতার বুকে বাড়ি খাড়া করুক, গাড়ি হাঁকিয়ে চলুক, সন্তান ও বউকে নিয়ে পাহাড়ে উঠুক, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাক। মানুষেব জন্যই নিউ মার্কেট। বাড়ির গাড়িতে চেপে বালিগঞ্জ থেকে চাকর আসুক এক কিলো মাংস কিংবা এক টাকার মসলা কিনতে। এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি—ওকি বউমা, ওদিকে চেয়ে কি খুঁজছ?'

'মাংসের দোকান। কোনদিন এদিকে আমি মাংস কিনতে আসি নি। কোন্ দিকে যাব?'

আমি দেখিয়ে দেব। ওকি, ওদিকে চললে যে? তোমরা কি বীফ খাও?

'খাই। সস্তা পড়ে। আজ এক কিলো ভেড়ার মাংস কিনতে এখানে আমায় আসতে হল। আধ কিলো কিনলেও চলত। কিন্তু ভাবছি ঠাকুরপোকে খেতে বলব।'

'সতু বুঝি আজকাল প্রায়ই তোমাদের ওখানে যায়?

'মাঝে মাঝে।'

'আশ্চর্য! তোমাদের প্রতি রোমকূপে বিপ্লবের বারুদ ঠাসা। অথচ বুঝতে পারি না ছোঁড়াটা কেন এখনো কবিতা লেখার বদ অভ্যাসটা ছাড়তে পারল না। কবি হওয়ার চেয়ে কমিউনিস্ট হওয়া অনেক ভাল, বউমা। ওর কানে বিপ্লবের মন্ত্র ঢোকাও। কবিতা লেখা যদি বন্ধ না করে তাহলে দশটা আঙুলই ওর ভেঙ্গে দাও।'

সিগারেটটা টানতে ভুলে গিয়েছিলেন গোপীমোহন। চামড়ায় লাগতেই অবশিষ্ট অংশটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে এমনভাবে তিনি জুতো দিয়ে ঘষে ঘষে আগুন নেভাতে লাগলেন যে, সুনন্দার যেন মনে হল, পণ্ডিতিয়া রোডের পরিবারটাকে জুতোর তলায় থেঁতলে দেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন পরিমলের বাবা।

'তাহলে চলুন, মাংসের দোকানটা আমায় চিনিয়ে দিন।' অনুরোধ কবল সুনন্দা।

'পয়সা নষ্ট করো না, বউমা। জানোই তো ছেষট্টির শেষ দিন আজ। এই দিনটিতে আমি কেনাকাটা করি। বাণ্টু আমার নাতি···একমাত্র ওয়ারীশ···সতু হয়তো সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবে—অতএব আমার একমাত্র নাতি শ্রীমান বাণ্টু আজ যখন ভাল মাংস খেতে চেয়েছে তখন মাংস কেনবার গৌরবটুকু আমায় অর্জন করতে দাও, বউমা। তোমাদের দেওয়ার জন্যই তো এখনো আমি এই পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে পারছি না। শুধু একটা অনুরোধ, ঐ ছোড়াটাকে কবিতা লিখতে দিয়ো না। আমি যত বড় পাষণ্ডই হই না কেন, আমি তো ওর বাপ। সতুর কল্যাণ হয় তা আমি চাইবই। চললে? আমি নিজেই তোমায় পৌঁছে দিতে পারতাম। কিন্তু অনেক দেরি হবে। ট্রাম ধরবে নাকি বউমা? আজ ট্যাক্সি চেপে যাও। ভাড়া আমি দেব। একটু তোমাদের সেবা করতে দাও···সুনন্দা, আমি যে পরিমলেব বাপ তা কি তুমি অস্বীকাব

করতে পারো? আমি জন্ম না দিলে পরিমলকে তুমি বিয়ে করতে কি করে?'

...আপনি আপনার ছেলে আর নাতির জন্য পয়সা খরচ করুন, আমি ট্রামে চেপেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আজ ছুটির দিন, এদিক থেকে ভিড় নেই।' চকিতের মধ্যে নিউ মার্কেটের ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল সুনন্দা। গোপীমোহন মিনিট কয়েক সেইদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কমরেড এক্‌রামূল্লার বিবিটিকে বিয়ে করেছে তাঁরই সবচেয়ে আদরের প্রথম সন্তান পরিমল সিংহ। কোনো একটা পাকা ব্যবস্থা না করে তিনি কখনোই এই পাপের পৃথিবীটা ত্যাগ করতে পারবেন না। পিতৃপুরুষের পরিচয়টা শুধু বাণ্টুই বহন করে চলবে—কথাটা ভাবতে গিয়ে গোপীমোহনের গেঞ্জীটা ঘামে সপসপে হয়ে উঠল।

জুতোর গোড়ালী দিয়ে সিগারেটের অংশটাকে আরো কয়েকবার ঘষে দিলেন তিনি।

ছেষট্টির শেষ দিনটাতে জিনিস কিনতে উৎসাহ বোধ করছেন না। সাতষট্টি সালটা বোধহয় ভাল কাটবে না। গোপীমোহন অন্তর্জগতে আলোড়ন অনুভব করছেন। এযাবৎকাল চাকরি করা, ঘুষ নেওয়া, ছেলেপুলেদের মানুষ করে তোলা আর বালিগঞ্জে বাড়ি তৈরি করা ছাড়া কোনো চিন্তাই ছিল না তাঁর। এই চার দেওয়ালের মধ্যেই বাস করেছেন তিনি। একজন স্বাভাবিক বাঙালীর জীবনে এর চেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্খা থাকে না। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজনের প্রশ্নের উত্তরে যদি তিনি বলতে পারেন, 'হ্যাঁ ভাই, কোনো রকমে বালিগঞ্জে একটা চারতলা বাড়ি তৈরি করেছি এবং তিনটে তলা ফরেন কোম্পানীর কাছে ভাড়াও দিয়েছি'—তাহলে তিনি

স্বর্গসুখ অনুভব করেন। গোপীমোহন অবিশ্যি বাড়ি তৈরি করে ফরেন কোম্পানীকে ভাড়া দেন নি, কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় যা তিনি কিনে রেখেছেন এই বাজারে তার নগদ মূল্য পাঁচ-সাত লাখের কম নয়। ইচ্ছে করলেই গোটা চার দশতলা বাড়ি তিনি তৈরি করতে পারেন। এতদিনে করেও ফেলতেন। শুধু পরিমল তাঁকে ব্যর্থ করেছিল বলে দু-চার বছরের জন্য তিনি থমকে গিয়েছিলেন। গোড়ার দিকে অতোটা নিবাশ তিনি হন নি। ভেবে ছিলেন, পার্টির ধরা বাঁধা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে পরিমল। এই বাড়িটার মতোই পবিমলেব চিন্তাধারা পুরনো। কিন্তু ভয় হচ্ছে সতুকে নিয়ে। সতুর চিন্তায় কালো লেবেল লাগানো নেই। কোনো লেবেলকে ভয় পান না গোপীমোহন। ছলে, বলে, কৌশলে যে কোনো লেবেলকেই মুছে দেওয়াব ক্ষমতা বাখেন। অত্যন্ত চতুর লোক তিনি। কিন্তু লেবেলহীন অদৃশ্য শত্রুব বিরুদ্ধে লড়াই করবার চাতুর্য তাঁর নেই।

সেই জন্যই গোড়ার দিকে পরিমল যখন পার্টিব কাজ আরম্ভ করেছিল তখন তিনি তাকে বাধা দেন নি। বাধা দেওয়ার দরকার বোধ করেন নি। ববং দু-একবার তাকে উৎসাহই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার চেয়ে দু-একটা দুষ্কর্ম করাও ভাল। কি করতে চাও আজ?'

অনুমতি নিতে এসেছিল পবিমল। বলেছিল, 'সবকাবী রাষ্ট্রনীতিব প্রতিবাদ কবে আমবা একটা মিছিল বাব কবব। মনুমেণ্টেব তলায় সভা ডাকা হয়েছে। কমরেড বসু সভাপতিত্ব করবেন। আমি যোগ দিতে চাই।'

'অতি উত্তম কথা। ভয়ের কিছু নেই। ভয় থাকলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় এখন ঠিক এই সময়ে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য শিলাবাসে গিয়ে বসে থাকতেন না। গো অ্যাহেড।'

জিনিস কিনতে কিনতে পুরানো কথাগুলি চিন্তা করছিলেন

গোপীমোহন। পরিমলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজেকে তিনি কখনো অপরাধী মনে করেন নি। তিনি জানতেন যে, পূর্ণ দাশ রোডের সম্পত্তিটা একদিন আঙুল ফুলে কলাগাছের মতো কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি হয়ে উঠবে। প্রাইভেট প্রপার্টির হাতুড়ি মেরে তখন তিনি পরিমলের আদর্শটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারবেন। পরিমল মাস্টার। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির মানে সে জানে। চারখানা বাড়ি পাশাপাশি তুলে ফেলতে পারলে তার ভাড়ার টাকার স্রোতে পরিমলের আদর্শের নৌকাটা যে ভেসে যাবে বঙ্গোপসাগরের দিকে তাতে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না। কিন্তু ভয় ছিল সতুর জন্য। ঐ ছোঁড়াটার শব্দাবলীর ভাণ্ডারে 'সম্পত্তি' কথাটা কোনোদিনও প্রবেশ করতে পারে নি।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তিনি পা দিয়ে ঘষতে লাগলেন। ভাবলেন যে, সত্যপ্রকাশও বোধহয় গুঁড়ো হয়ে গেল। কোনো লেবেল নেই বলেই সতুর ওপরেই রাগ তাঁর বেশি।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই জিনিসপত্র কিনে ফেললেন সব। কেনা-কাটার মধ্যে মন নেই। কেমন একটা বন্দী-বন্দী ভাব। যেন চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। পরিমল, সুনন্দা, বাণ্টু আর সতু তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছে। ইচ্ছে করলেই এদের এড়িয়ে চলতে পারেন, দীর্ঘদিন এড়িয়ে চলেছিলেনও, কিন্তু অদৃশ্য দেয়াল চারটে তাঁকে মুক্তি দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে চলে। ঘেরাও করে রাখে। কেটে বেরিয়ে যেতে পারেন না। তবে কি সমাজের সব ক'টি ধনী আর স্বার্থপর লোক তাঁরই মতো ঘেরাও-যন্ত্রণা অনুভব করছেন ?

একশো টাকার ফল কিনলেন গোপীমোহন। এখন শুধু একটা জ্যান্ত পাঁঠা কিনে ফেলতে পারলেই ছেষট্টির কেনাকাটা শেষ হয়ে যাবে।

বেলা প্রায় দুটো। এবার তিনি বাড়ি ফিরে চললেন। ক্লান্ত

বোধ করছেন গোপীমোহন। ফ্লাস্ক থেকে জল খেলেন একটু। বেরুবার সময় ফ্লাস্কে করে জল নিয়ে আসেন। হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢোকেন না। তাঁর বিশ্বাস, কলকাতার কোনো জিনিসই বিশুদ্ধ নয়। নিজেকে সুস্থ রাখবার জন্য সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করে চলেন।

পার্ক স্ট্রীট ধরেই বালিগঞ্জে ফিরে আসছিলেন। এঞ্জিনটা আর বন্ধ হয়নি। পেছনের সীটে অনেকগুলো প্যাকেট পড়ে রয়েছে। তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারির জন্য প্যাকেটগুলো আগে থেকেই আলাদা আলাদা করে বাঁধিয়ে এনেছেন। পরিমলদের জন্য এবার আর প্যাকেট নয়, জ্যান্ত একটা পাঁঠা কিনেছেন। কালোর ওপর সাদা সাদা ফুটকী। সেটাও পেছন দিকে রয়েছে। চলতে চলতে ডেকে উঠতে পারে বলে গোপীমোহন বিক্রেতার কাছ থেকে কচি কচি বটপাতা নিয়ে এসেছেন। সবসুদ্ধ দুটো ডাল। পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছতে পৌঁছতে একটা শেষ করেছে। পেছন ফিরে তিনি দেখলেন, দ্বিতীয়টি থেকে জ্যান্ত পাঁঠা কুটকুট করে পাতাগুলো ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। পণ্ডিতিয়া রোড পর্যন্ত এখন পৌঁছে যেতে পারলেই হল।

পার্ক স্ট্রীট আর পার্ক সার্কাসের মোড়ে এসে থামতে হল। না থামলেও হতো, লাল আলোটা নিভে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটা শোভাযাত্রা তীব্র বেগে উল্টোদিক থেকে পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল। পাশ থেকে একটা সেপাই এসে ওদের পথটা পরিষ্কার রাখবার জন্য গোপীমোহনের গাড়ির সামনে হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনি লক্ষ্য করলেন, সেপাইটার মুখে যেন আনন্দের আলো জ্বলে উঠল। ডিউটি দেওয়ার জন্য এই বোধহয় সে প্রথম উৎসাহ বোধ করছে। দেহটাকে ঋজু আর কর্মচঞ্চল করে তুলল। শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে মাথাটাকে নিচু করে বোধহয় শ্রদ্ধাও জানাল সে।

গোপীমোহন আবার গাড়িটাকে পার্ক স্ট্রীটের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। শোভাযাত্রার বাঁ-পাশ দিয়ে এগিয়ে এলেন সামনের দিকে। বান্টুকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। বান্টু স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। বেচারী বান্টু! খোঁড়াতে খোঁড়াতে সাহেব পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে সে। ছেলেটার পায়ের দিকে নজর রেখেছিলেন তিনি। গতি যত বাড়ছে খোঁড়া পা-টা যেন তত বেশি সোজা হয়ে যাচ্ছে। বিস্মিত বোধ করলেন গোপীবাবু। বত্রিশ টাকা ভিজিটওয়ালা ডাক্তারও ওর পা-টাকে সিকি ইঞ্চি সোজা করতে পারেন নি। তিনি নিজে পকেট থেকে অনেক টাকা খরচ করেছিলেন। অথচ এখন দেখলেন যে, মিছিলের গতির মধ্যে পড়ে বান্টু রীতিমতো সোজা হয়ে হাঁটছে।

পকেট থেকে দাঁত খোঁচাবার কাঠি বার করলেন গোপীমোহন। রূপোর কাঠি। দাঁত খোঁচানোটা তাঁর একটা মুদ্রাদোষ। দাঁত মুক্তোর মতো ঝকঝক করলেও হঠাৎ হঠাৎ রুপোর কাঠি দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন তিনি। মাথায় যখন বদ-বুদ্ধি আসে তখনি তিনি দাঁত খোঁচাতে থাকেন।

পুরো পার্ক স্ট্রীটটা দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে পার হয়ে গেলেন। বান্টুর প্রায় পাশে পাশে ছিলেন বলে সে তাঁকে দেখতে পেয়েছিল। মাঝে মাঝে দাদুর দিকে চেয়ে হাসছিল আর বলছিল, 'গাড়ি থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও দাদু।'

শীতের দিন, বান্টু তবু ঘেমেচুমে সপসপে হয়ে উঠেছে। কলকাতার কোন্ প্রান্ত থেকে যে পথ চলতে আরম্ভ করেছে গোপীমোহন তা জানেন না। কে জানে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই হয়তো বান্টুরা শুধু হেঁটেই চলেছে। পৃথিবীর বুকে যতদিন না ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন এদের পথ চলা শেষ হবে না।

গাড়িতে বসেই নাতির সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন গোপীমোহন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন থেকে হাঁটছিস?'

'ত্বঘণ্টা –দাঁড়াও একটা শ্লোগান দিয়ে নিই।' বান্টু শ্লোগান দিল, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ। তুমি কোথায় যাচ্ছ, দাদু ?'

'কালকে নতুন বছর। বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। সবাই আজ থেকেই আমোদ-প্রমোদ করতে শুরু করেছে, তোরা কেন মিছিল বার করলি আজ ?'

'আমি জানি না।'

'কে জানে ?'

'আমাদের লীডার।'

'তোদের লীডারের নাম কি রে ?'

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ—' হঠাৎ আবার শ্লোগান দিল বান্টু।

গাড়িটাকে আরো একটু ওর কাছে এগিয়ে নিয়ে গোপীমোহন বললেন, 'গাড়ির মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে দেখ—'

'কি দেখব ?'

'তোর জন্যে একটা জ্যান্ত পাঁঠা কিনে নিয়ে যাচ্ছি। তোদের লীডারের নাম কি রে ?'

ঘাড়টা কাত করে গাড়ির মধ্যে উঁকি দিতে গিয়ে জলের ফ্লাস্কটা চোখে পড়ল বান্টুর। জিজ্ঞাসা করল, 'দাদু, ওতে জল আছে ?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন গোপীমোহন। চাতকের মতো তাঁর দিকে চেয়ে সে বলল, 'বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দাও না দাদু।'

'এক ফোঁটাও জল নেই, সব খেয়ে ফেলেছি। গাড়িতে উঠে আয়, ওপাশের ঐ বড় হোটেল থেকে জল খাইয়ে আনছি।'

'ও কি ! ও কি করছ, দাদু ? চাপা দেবে নাকি ?'

জবাব দিলেন না গোপীমোহন। গাড়িটা থামিয়ে দিলেন। মিছিলটা পার হয়ে গেল। হাত কাঁপছিল তাঁর।

মিছিলটা পার হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বেশি দূরে এগিয়ে

যেতে পারে নি। সামনের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই গোপীবাবু দেখলেন, মিছিলটা যেন টাল খেয়ে ছিটকে পড়ল বাঁ দিকে। পথের দু'দিকের প্রত্যক্ষদর্শীরাও যেন নেমে পড়ল রাস্তার ওপর। গাড়ি চালিয়ে তিনি চলে এলেন সামনের দিকে। রাস্তার ধারে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গোপীমোহন গাড়ি থেকে নেমে এলেন। এখন আর শোভাযাত্রাটা আলাদা নেই, জন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চারদিক থেকে লোক এসে প্রকাণ্ড বড় একটা আমেরিকান গাড়িকে ঘিরে ধরল। হল্লা-চিৎকার উঠল, 'মারো মারো, আগ্ জ্বালা দেও—'

গোপীমোহন দেখলেন, লাল ঝাণ্ডাটা একজন সঙ্গীর হাতে গুঁজে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বান্টু চলে গেল ভিড়ের মাঝখানে। ধনুকের মতো বাঁকা পা-টা বিন্দুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি করল না।

উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করছিলেন গোপী-মোহন। তিনি দেখলেন আমেরিকান গাড়িটাকে ঘিরে ধরেছে জনতা। সওয়ারী দু'জনকে কোথায় যে টেনে নিয়ে গিয়েছে তিনি তা বুঝতে পারলেন না। কেউ বলছে মারোয়াড়ী, কেউ বলছে বাঙালী। কি অপরাধ, কেন তাদের মারধোর করছে? গাড়িটাতে আগুনই বা লাগাল কেন? অতো বড় একটা দামী আমেরিকান গাড়ি, নিশ্চয়ই মোটা টাকার ইনসিওর করা আছে—মনে মনে টাকার অঙ্কটাও তিনি ধার্য করে ফেললেন। কিন্তু এইসব হট্ট-গোলের কারণ কি? গোপীমোহন শুনলেন, শোভাযাত্রার একটি ছেলের গায়ে গাড়িটা ধাক্কা মেরেছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললেন, 'না মশাই না। ছেলেটাই ইচ্ছে করে গাড়িটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। এমন সুন্দর তেলতেলে মসৃন একটি গাড়ির ওপর আমারও মশাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ছেলেটির গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। কিন্তু তা সত্বেও ছেলে দুটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধোর করতে শুরু

করেছে। মশাই, কলকাতার জনতার সৌন্দর্যবোধ নেই—মারোয়াড়ীকে ঠ্যাঙ্গাও আপত্তি নেই, কিন্তু আমেরিকান গাড়িটাতে আগুন লাগাল কেন ?

গোপীমোহনের বাঁ দিক থেকে একটি ধুতি পরিহিত যুবক সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে জবাব দিল, 'ভিয়েৎনামের কথা স্মরণ করুন, দাদা। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর বোমা ফেলছে এরা, আর আপনি একটা মোটর গাড়ির জন্য দুঃখ বোধ করছেন !'

'তাও তো ষাট হাজার টাকার ইনসিওরেন্স রয়েছে—' মন্তব্য করলেন গোপীমোহন। মন্তব্য না করলেই ভাল হতো। তাঁর চারদিকে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেল। নানা রকমের কথা কাটাকাটিও হতে লাগল।

ওখান থেকে সরে এসে গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা জল খেলেন গোপীমোহন। বাকী জলটুকু ফেলে দিলেন ফুটপাতের ধারে।

মাথা থেকে রক্ত পড়ছিল বাণ্টুর। একটু পরেই সে সত্যপ্রকাশ আর রতিলালকে ভিড়ের মধ্যে থেকে টানতে টানতে নিয়ে এল গাড়িটার কাছে। গোপীমোহনকে দেখতে পেয়ে বাণ্টু বলল, 'গাড়িটাকে রক্ষা করা গেল না। আগুন লাগিয়ে দিল ওরা।'

'ওরা কারা ?' জিজ্ঞাসা করলেন গোপীমোহন।

'আমাদের শোভাযাত্রার কেউ নয়। রাস্তার লোক। কাকুকে নিয়ে তুমি চলে যাও, দাদু।'

রুপোর কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগলেন গোপীবাবু।

রতিলালের কব্জি থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়েছিল জনতা। গোপীবাবুর কাছ থেকে সময়টা জেনে নিয়ে রতিলাল বলল, 'আমি চলি, সতু। বহু লোক এসে বাড়িতে অপেক্ষা করবে—বেচারী সতু ! মোড়ের মাথায় দেখা হয়ে গেল, গাড়িতে তুলে নিলুম। আমার ওখানেই যাচ্ছিল সে—আমার সঙ্গে সঙ্গে সতুও মার খেল।'

'বাণ্টু না থাকলে মেরেই ফেলত।' বলল সত্যপ্রকাশ।

'আমার হাতে আর সময় নেই। আমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাচ্ছি। তুই যাবি আমার সঙ্গে?' জিজ্ঞাসা করল রতিলাল।

'না, আমি পরেই যাব।'

জবাব শোনবার আগেই কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল রতি-লাল। বাবার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল সত্যপ্রকাশ। হাতে তার ফ্লাস্ক রয়েছে, জল খেয়ে ফ্লাস্কটা ভেতরে রাখবার সময় পান নি। গোপীবাবু লক্ষ্য করেন নি যে ফুটপাথের ওপর থেকে জলের একটা সরু রেখা গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁর পাম্পশু'র তলা দিয়ে বাণ্টুর খোঁড়া পা-টাকে স্পর্শ করছে।

বাণ্টুর মাথা থেকেও একটা রক্তের শ্রোত গড়িয়ে পড়ছিল। সেই মাথাটাই নিচু করে অবাক হয়ে সে জলের শ্রোতটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

সতু বলল, 'বাবা, বাণ্টুকে নিয়ে আমি একবার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। তুমি কি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?'

'বত্রিশ সনের ফোর্ড। ধীরে ধীরে চলে। তোদের যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। ট্যাক্সি চেপে যা।'

'গোটা কয়েক টাকা দেবে বাবা?' হাত বাড়াল সতু।

এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেলতে লাগলেন গোপীমোহন। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি বললেন, 'ঐ ছাখ, রতিলাল ট্যাক্সিতে উঠছে। পেছন থেকে কী অদ্ভুত লাগছে দেখতে।'

রতিলালের গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। শার্টের অর্ধেকটা নেই। বাকী অর্ধেকটা ঝুলে পড়েছে কোমরের ওপর। পরাজিত ও লাঞ্ছিত পতাকার মতো শতছিন্ন টুকরোটা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মারোয়াড়ীর কোমরের তলায়। আর বাণ্টুর লাল পতাকাটা

সগর্বে মাথা উঁচু করে মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করছে। বাণ্টু ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে না পড়লে রতিলাল আজ প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারত না।

গোপীমোহন বললেন, 'ক্রোড়পতির সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে চলে গেলে ভাল হতো, সতু।'

'কি ভাল হতো?'

'টাকা পয়সার জন্য আমার কাছে আর হাত পাতবার দরকার হতো না। সঙ্গে আমি পাঁচ-দশ টাকার বেশি রাখি না। হঠাৎ যদি পেট্রল কিনতে হয়—'

'বেশ দশ টাকাই দাও—'

'কাকু তুমি চলে যাও। এখন আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় নেই। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের মনুমেন্টের তলায় গিয়ে পেঁছতে হবে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ'—শ্লোগান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলটা আবার রাস্তার একপাশে এসে সারি-বদ্ধ হয়ে গেল। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বাণ্টু চলে গেল সামনের দিকে। রাস্তার মাঝখানে আমেরিকান গাড়িটা এবার দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

সতু বলল, 'বাবা, তোমার গাড়িতে একটু বসছি—দু' মিনিট—'

'কেন?'

'মনে মনে দু-লাইন কবিতা এসে গিয়েছে। কাগজে লিখে ফেলব।'

'কবিতা না লিখে আগুনটা নিভিয়ে ফেলবার চেষ্টা কর।'

'তোমার ফ্লাস্কে তো এক ফোঁটা জলও নেই—' এমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল সত্যপ্রকাশ যে, গোপীমোহন তা সহ্য করতে না পেরে গাড়িতে উঠে বসলেন। কথা বললেন না।

ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলেন গোপীমোহন। মিছিলটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু তবু তাঁর মনে হতে লাগল, বাণ্টু

যেন তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছে। একটা দেয়ালের মতো যেন তাঁর নাকের ডগা ছুঁয়ে খাড়া হয়ে আছে সে। তিনি বোধহয় আজ সেই দেয়ালটাই ভেঙে দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা দেয়াল ভাঙলেই তো সমস্যা মিটছে না। আরো তো তিনটে দেয়াল রয়েছে। তা ছাড়া একটা সিলিং রয়েছে না? সর্বক্ষণই সেটা খাঁড়ার মতো মাথার ওপরে ঝুলছে। সিলিংটা হচ্ছে মমতা। মমতা সিলিং।

ধাক্কা মেরে তাকে হ্রদের জলে ফেলে দিয়েছিলেন গোপীমোহন। পৌনে তিন মণ ওজনের বোঝাটা সংসারের কোনো কাজেই লাগছিল না। বাড়িতে বসে শুধু দিনরাত ঘামত। কাছে যাওয়া যেত না। পচা ঘামের গন্ধ ছাড়ত। গোপীমোহন কোনো রকম পচা জিনিস সহ্য করতে পারেন না।

খালি ফ্লাস্কটা পাশের সীটেই পড়ে ছিল। মনে মনে আনন্দ অনুভব করছেন। বান্টু তাঁর নাতি। ষ্টিয়ারিংটার ওপর ঝুঁকে বসে চৌরঙ্গীর রাস্তার ওপরেই প্রার্থনা করলেন, 'হে ভগবান, পৃথিবীর কোথাও যেন এক ফোঁটাও আর জল না থাকে। চাতকটা শুধু জলের প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে থাক মেঘমুক্ত আকাশের দিকে।'

মনে মনে কবিতাটা রচনা করতে করতে সেন্ট্রাল অ্যাভেনুর দিকে এগিয়ে চলেছিল সত্যপ্রকাশ। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। বেচারী রতু! চৌরঙ্গীর মাঝখানে আমেরিকান গাড়িটা জ্বলছে। দমকল এসে অপেক্ষা করছে। জনতা তাদের আগুন নেভাতে দিচ্ছে না। পুলিশ না আসা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে। গাড়িটা যতক্ষণ না অর্ধেকটা পুড়ে যাবে পুলিশ ততক্ষণ আসবেও না। অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না সতু। রতিলালের বাড়ি যেতে হবে। সে ওকে দেখা করতে বলেছে। আজই ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাচ্ছে রতিলাল।

আগুনের উত্তাপ ওর গায়ে লাগছিল না, তবু মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে উঠেছে। আজ ক'দিন থেকেই ভারী ভারী ঠেকছিল। কয়েকটা দিন একেবারে আলাদা হয়ে নিরিবিলিতে গিয়ে বাস করবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। শুধু কয়েকটা দিনের অজ্ঞাতবাস। চেনা মুখগুলোর সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। হাজার দুই টাকা দরকার। টাকাটা হাতে পেলেই হাওয়া হয়ে যেতে পারে। সমস্ত সংসারটাই কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে ওর কাছে। হাসি পায় আবার দুঃখও বোধ করে। এই শহরের প্রতিটি মানুষই যেন একটা বিষাক্ত চক্রের মধ্যে দিনরাত শুধু ঘুরপাক খেয়ে মরছে। প্রত্যেকেই মনে মনে একটা না একটা অভিযোগ বহন করে বেড়াচ্ছে। কেউ সন্তুষ্ট নয়, কেউ সুখী নয়।

চক্রটার বাইরে বসে শুধু দিন গুনছে বৌদি আর বান্টু।

কবিতার লাইন ক'টা মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে এগিয়ে চলেছিল সত্যপ্রকাশ। রতিলালের বাড়ি গিয়ে প্রথমেই লাইন ক'টা লিখে ফেলতে হবে। চৌরাস্তার মোড়টা পার হওয়ার আগে সত্যপ্রকাশ আবৃত্তি করল ঃ

—মরেও বয়ে নিয়ে যাও তোমার সকল ক্ষুধা,
তোমার অহমিকা, আর সকল মহাপাতক।
প্রিয় শয়তান, দয়া করে একটু কম কুপিত দৃষ্টি হানো—

পাশে দাঁড়িয়ে তুতুল দিদি বলল, 'এই যে সতু। কোথায় চললি? বিড়বিড় করে এই মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বলছিস রে?'

'কবিতা।'

'কার কবিতা?'

'একজন ফরাসী কবির কবিতার তর্জমা। তুমি এই ভিড়ের মধ্যে কি করছ?'

'সতু, চল্—আমার ফ্লাটে একবার চল্—সব কথা তোকে বলব—অনেক কথা জমে রয়েছে মনে।'

সতুর হাত ধরে টান মারল তুতুল দিদি।

'এখানে দাঁড়িয়েই বলো না—এখন পার্ক স্ট্রীটে গেলে দেরী হয়ে যাবে—'

'ভিড়ের মধ্যে গোপন কথা বলি কি করে? ট্যাক্সি ধরছি, দাঁড়া।'

তুতুল দিদির সঙ্গে সতুর কি করে এবং কবে যে চেনা হয়েছিল সেকথা ওর মনে নেই। দিল্লী-কলকাতায় তার নাম আছে খুব। এক-সময় দামও ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রীর সঙ্গে ভাবও ছিল তার। মন্ত্রীটি অকর্মন্য না হলে হয়তো বা তাঁর সঙ্গে বিয়েও হয়ে যেত। এখন বয়স হয়ে গিয়েছে। গোটা চল্লিশ তো হবেই। যারা তাকে চেনে না তারা তাকে ত্রিশের বেশি মনে করে না।

বিলেত ঘুরে এসেছে তুতুলদিদি। তখন তার পুরো যৌবন। অভিভাবকদের শাসন ছিল না বলে একজন বাঙালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী তাকে বিলেত নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ব্যাঙ্ক গেল ফেল হয়ে—তুতুল দিদিও ভারতবর্ষে ফিরে এসে সরকারী চাকরিতে ঢুকে গেল। আহা, তখনো যদি বিয়ে হয়ে যেত তাহলে ছেলেপুলে নিয়ে জাঁকিয়ে ঘর সংসার করতে পারত। বালিগঞ্জে তিনতলা বাড়ি হত। একতলা দু-তলা ভাড়া দিয়ে তিন তলায় বসে পরম নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে পারত সে। তেল কোম্পানির কভেনেনটেড অফিসার থেকে শুরু করে রাজ্যহীন রাজপুত্র পর্যন্ত তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। তুতুলদিদির জন্য দুঃখ বোধ করে সতু। বেচারি এখন চাকরি করছে। ছ-সাতশো টাকা মাইনে পায়। আর ছ-তলা বাড়িতে বাস করছে সেই ব্যাঙ্ক ফেল করা ব্যবসায়ীটি। তার ফাঁসী হয়নি, শাস্তি হয়নি, গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। একজন কংগ্রেসী মন্ত্রীর সাহায্যে ছ-তলা বাড়ি তুলেছে। চাকরী করছে তুতুলদিদি। পেট ভরছে বটে, কিন্তু মন

ভরছে না। বরের বাজার ফাঁকা। এমন কি মধ্যবয়সী ব্যাচিলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরাও বাজারের সীমানা অতিক্রম করে না। তুতুল দিদি এখন পার্ক স্ট্রীটের একটা উঁচু ম্যানশনের ছু'কামরার ফ্ল্যাটে বাস করে। ভাল ভাল সিল্কের শাড়ি পরে, বিলেতী সেন্ট মাখে। সতু জানে, তা সত্ত্বেও তুতুলদিদি অসুখী। চল্লিশ হয়েছে, এখনো দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে—নিঃসঙ্গতার হুল ফুটছে মনে এবং দেহে। আর নাতি নাতনিদের নিয়ে ছ-তলা বাড়িতে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাচ্ছে ব্যাঙ্ক ফেল-করা ব্যবসায়ী। তার ফাঁসি হয় নি, শাস্তি হয়নি—এমন কি একটি আঁচড় পর্যন্ত গায়ে লাগে নি। কংগ্রেসী আমলের ইতিহাসে ব্যবসায়ীটি অমর হয়ে রইল। লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত আর বিধবাদের চোখের জলে সেই ইতিহাসের একটি পাতাও তো ভিজে উঠল না। পার্ক স্ট্রীটের দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে সত্যপ্রকাশ বলে উঠল, 'এই আজাদী ঝুঠা হ্যায়—যাক গে, যাক গে, আমার কথায় কান দিয়ো না। এবার তোমার গোপন কথাটা বলো। তোমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলে।'

'বলছি—' সতুর ঘাড়ের ওপর বুক ঠেকিয়ে জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তুতুলদিদি বলল. ফুটপাতের ওখানে কাল একটা লোক এসেছিল—বসে বসে ভাগ্যগণনা করছিল—তাও নিজে করছিল না—'

'তবে ? তুতুলদিদি আমার ঘাড়ের ওপর অতো চাপ দিয়ো না। মাইরী বলছি—'

'চুপ কর্ সতু। তোর ঘাড়ের ওপর আমার সুখের খাঁচা বেঁধে রাখি নি—শোন্, সেই লোকটা একটা খাঁচা নিয়ে এসেছিল—'

'হাত ছুটো একটু আলগা করো, আমি ঘুরে দাঁড়াই। হ্যাঁ, এবার বলো। খাঁচা নিয়ে কি করছিল লোকটা ?'

'ভাগ্য গণনা। খাঁচার মধ্যে একটা পাখি ছিল। বড় অদ্ভুত পাখি। পাখিটার মুখ থেকে গণনা বেরিয়ে এল—'

আনন্দ প্রকাশ করে সতু বলল, 'তাহলে সত্যি হতে বাধ্য। তুতুলদিদি, সত্যি হবেই।'

'ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ। পাখিরা পাপ করে না। ওরা মন্ত্রী নয়, ব্যাঙ্কও ফেল করায় না। মধ্যবিত্ত আর বিধবাদের টাকা মেরে ছ-তলা বাড়িও তৈরি করে না। ওদের কথা সত্যি হতে বাধ্য।'

'কথা নয়, সতু। কতকগুলো টুকরো কাগজ লোকটা পাখির সামনে ফেলে রেখেছিল। তার মধ্যে থেকে ঠোঁট দিয়ে একটা কাগজ তুলে নিল—জানিস তাতে কি লিখা ছিল?'

'না।'

'ভবিষ্যৎবাণী। কাউকে বলিস না যেন—'

'পাগল! ভবিষ্যৎবাণী কাউকে বলতে নেই। বললে ফল পাওয়া যায় না।'

'শুধু তোকেই বলছি।' সতুর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে ধরে তুতুলদিদি বলল, 'ওতে লেখা ছিল আমার বিয়ে হবে। হবে একজন রাজপুত্রের সঙ্গে। সতু, চিড়িয়া বলেছে বিয়ে হবে আমার—' আনন্দে চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল তুতুলদিদির।

জীবনের সবটুকু গাম্ভীর্য সংগ্রহ করে এনে সত্যপ্রকাশ বলল, 'পাখির গণনা কখনো মিথ্যে হতে পারে না।'

ঝরঝর করে তুতুলদিদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেন্ট্রাল অ্যাভেনুর ফুটপাত ধরে রতিলালের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছিল সতু। ভাবছিল কয়েকটা দিন অজ্ঞাতবাসে গিয়ে থাকবে। হাজার দুই টাকার দরকার।

বাবার কাছে অবশ্য পাওয়া যাবে না। রতিলালের কাছে হাত

পাতলেই দিয়ে দেবে। কিন্তু ওর সঙ্গে সম্পর্কটা এতো বেশি ঘন যে, হাত পাততে লজ্জা করে। গোল পার্কে গীতা বৌদির কাছে না চাইলেও পাওয়া যায়। কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি ওর পুরো অস্তিত্বটাই দাবি করে বসবেন।

সেণ্ট্রাল অ্যাভিনুর ফুটপাত ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছিল সত্যপ্রকাশ। আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন বটে, কিন্তু তা সত্বেও কেমন যেন বন্দী-বন্দী ভাব। মাত্র হাজার দুই টাকা পর্যন্ত হাত বাড়ালেই শর্তহীন ভাবে পাওয়া যায় না। লেখাপড়া না থাকলেও দু-একটা শর্ত অলিখিত থাকে। স্বাধীন পৃথিবীতে সতুও যেন অলিখিত শর্তের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে।

গীতা বৌদি ওর প্রেমে পড়েছেন। দেবদাস মিত্র ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। গীতা বৌদির বয়স মাত্র সাতাশ। বছর সাত আগে দেবদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। দেবদা তখন কোন্ একটা অফিসে যেন কেরানীর কাজ করতেন। তারপর ভাগ্যগুণে কোন্ এক কংগ্রেসী নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে যায়। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। আমদানি আর রপ্তানি বাণিজ্যের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে লাখ লাখ টাকা আসতে লাগল। কাঠাপ্রতি চল্লিশ হাজার টাকা দাম দিয়ে গোল পার্কে জমি কিনলেন দেবদাস মিত্র। তারপর মস্তবড় একটা বাড়িও তৈরি করে ফেললেন তিনি। সাধনা কিংবা তপস্যা করার দরকার হল না—এমন কি ব্যবসা শেখবারও প্রয়োজন হল না, রাতারাতি সাফল্যলাভ করলেন। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যা সম্ভব হতো সেটা কংগ্রেসী আমলে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সম্ভব হল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই।

ঘাড়ের তলা থেকে চুলের প্রান্ত ছেঁটে ফেললেন গীতা বৌদি। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। পাখা গজাল। রিপন স্ট্রীট থেকে একটি মেমসাহেবকে ধরে নিয়ে এলেন দেবদা। গীতা বৌদি ইংরেজিতে

কথাবার্তা শিখতে লাগলেন। বছর দুই চেষ্টার পর মধ্যবিত্ত সমাজের চিহ্নগুলো সব মুছে ফেললেন তিনি। প্রসাধন আর পরিচ্ছদের গুণে বয়সটা আর ধরতে পারা যায় না। বয়স সাতাশ। কিন্তু দেখলে যুবতীই মনে হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষের দিকেও যুবতী থাকবেন বলে আশা করা যায়। প্রথম দিকে স্বামীর সঙ্গেই ক্লাব হোটেলে যাওয়া-আসা করতেন। এখন দুজনেরই সঙ্গীসাথী বদলে গিয়েছে। দুজনেই মাছের মত মদ্য পান করেন। সন্তানাদি হয়নি বলে গীতা বৌদির হাতে কোনো কাজও নেই।

স্বামী স্ত্রীর আলাদা আলাদা ঘর। পাশাপাশি। ঝি-চাকরদের চোখে খারাপ দেখাবে বলে মাঝখানে যোগাযোগের একট দরজা আছে। এপাশ থেকে গীতা বউদি ছিটকিনি লাগিয়ে রাখেন। দেবদা তাতে আপত্তি করেন না। সতুর বিশ্বাস, গীতা বউদিকে ব্যবহার করেন না দেবদা। দুজনের মধ্যে অতি সুন্দর একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। কারো স্বাধীনতায় কেউ হাত দেন না। বউদির নামে একটা আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলে দিয়েছেন দেবদাস মিত্র। বেশ মোটা টাকা। প্রতি মাসে আবার নতুন টাকাও জমা দেন তিনি। গীতা বউদি শুধু চেক কেটে টাকা তোলেন, জমা দেন না। কি করে যে টাকা জমা দিতে হয় তাও তাঁর জানা নেই।

সতু মাঝে মাঝে যেত সেখানে। গোড়ার দিকে ব্যাপারটা সে বুঝতে পারে নি। এখন মনে হয় গীতা বউদি ওর প্রেমে পড়েছেন। যখন তখন টেলিফোন করে ওকে ডাকাডাকি করেন। হোটেল-ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরেন মধ্যরাত্রিতে। সতু তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো দিন মধর্যাত্রিতেই টেলিফোন ধরতে হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘুম থেকে তুলে দেন বাবা। সতুর বয়সে টেলিফোনের আওয়াজ শুনে ঘুম

ভাঙবার কথা নয়। বাবাও প্রায়ই ঐ সময়ে বাড়ি ফেরেন। টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সতুকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলেন, 'গীতা তোকে ডাকছে রে সতু।'

'এতো রাত্রে?'

'আহাম্মক, নাইট ইজ ইয়াং! আমার পুরুষত্ব থেকেই তোর জন্ম। অথচ রাত বারোটাকে বলিস এতো রাত্রি। মেয়েটাকে ভাল লাগে আমার। বাংলা দেশের ছ কোটি মেয়ের মতো চরিত্রটা ওর লেপা-পোঁছা নয়। আই মীন্ বিশেষত্ব আছে। বাংলা উপন্যাস কিংবা ফিল্মে এর দাম না থাকতে পারে, কিন্তু জ্যান্ত একটি যুবকের কাছে দাম থাকা উচিত। বালিগঞ্জের গড়িয়াহাটার দোকানগুলোতে যারা শাড়ি ব্লাউজ কেনে তাদের ভিড়ের মধ্যে এমন জিনিস দেখতে পাওয়া যায় না। লাইভলি, টগবগ করছে, জ্যান্ত—'

মাঝে মাঝে বাবাকে ওর একটি জ্যান্ত পাপের মতো মনে হয়।

সতুর ধারণা, বাবা ওকে নষ্ট করবার চেষ্টা করেন। মতলবটা তাঁর ভাল নয়। সতু এখন একতলার ঘরে এসে ঘুমোয়, টেলিফোন থেকে অনেক দূরে। পাশের ঘরেই থাকে কানাই। এ বাড়ির পুরানো চাকর। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। গতকাল সে কানাইকে জিজ্ঞাসা করেছিল, হাজার দুই টাকা পাওয়া যায় কি করে, বলতে পার কানাইদা?'

'বাবুর কাছ থেকে পাবে না।'

'কেন? মরবার সময় মানুষ তো এক আধলাও সঙ্গে নিতে পারে না!'

'দাদাবাবু, ওসব টাকা তুমি ভোগ করতে পারবে না।'

'কেন পারব না কানাইদা, গাদা গাদা অবৈধ ওয়ারীশ আছে বুঝি?'

'তা হয়তো আছে। থাকাই স্বাভাবিক। পাপের ধর্মই হচ্ছে

যত বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে। আসল কথা হচ্ছে, তোমার হাতে যখন টাকা আসবে তখন তোমার বয়স হবে প্রায় সত্তর।'

'বাবা অতোদিন বাঁচবেন বুঝি?'

'একশ বছর বাঁচবেন। একশ বছরে পা না দেওয়া পর্যন্ত তিনি এই পাপের পৃথিবীটা ত্যাগ করতে পারবেন না। আরো তেতাল্লিশ বছর তাঁকে স্বর্গে যাওয়াব জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

'বাবা এতো শিওর, মানে নিশ্চিন্ত হলেন কি করে?'

'জ্যোতিষসম্রাট গণনা করে বলেছেন।'

'তাহলে তো আমার ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। থাকগে, বাবার আয়ু নিয়ে, আর আলোচনা করে সময় নষ্ট করব না। ঘুম আসছে।' পাশ ফিরে শুয়ে সতুই জিজ্ঞাসা করেছিল, কানাইদা, এমন একটা জায়গা আমায় ঠিক করে দিতে পারো যার হাজার মাইলের মধ্যে কোথাও টেলিফোন নেই?'

জবাবটা শোনবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সত্যপ্রকাশ।

সোজাসুজি তিনতলায় উঠে এল সত্যপ্রকাশ। তিন তলাতেই রতিলালের অফিস। তার ওপরেও আরো বোধ হয় গোটা চার তলা আছে। কোন দিন গুণে দেখবার চেষ্টা করেনি সে। বাড়ির চাকর দারওয়ান আর চাপরাশীরা সকলেই ওকে চেনে। অন্দর-মহলেও প্রবেশ করবার অধিকার আছে ওর। রতিলালই এই স্বাধীনতাটা ওকে দিয়েছে। ইচ্ছে করেই ঠেলে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় বলে সুশীলার আর সময় কাটতে চায় না। সতু ওর বউকে সঙ্গ দেবে। সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবে। আরো যা যা দরকার সবই করবে সতু। সে সবই জানে, সবই বোঝে। কিন্তু মাড়োয়ারী বউ বলে ভয় পায় না সতু।

রতিলালের অফিস ঘরের সংলগ্ন একটা বেড কাম ড্রইংরুম

আছে। ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সাততলায় উঠে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে না। এখানেই একটু ঘুমিয়ে নেয়। পৃথিবীর বড় বড় শহরের বড় বড় হোটেলে ওর ঘুমনোর অভ্যাস বলে নিজের বাড়িটার প্রতি রতিলালের তেমন আর আকর্ষণ নেই। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে এখানে ঘুমোয়। সুশীলার ধারে-কাছে যেতে না হলেই মনে মনে খুশি হয় সে। সেই সময়টাতেই নতুন নতুন প্ল্যানও আসে মাথায়।

অফিস ঘরে গিজগিজ করছে লোক। রতি ওখানে ছিল না। তাহলে নিশ্চয় ঐ ঘরটাতে আছে। সতু রাস্তাঘাট চেনে। সেখানেই ঢুকে পড়ল সে।

রতিলাল ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা অশ্লীল উপন্যাস পড়ছিল। ঘরটাতে পৃথিবীর যাবতীয় অশ্লীল উপন্যাস সাজানো রয়েছে। কতকগুলি খোলাবাজার থেকে কেনা, বাকীগুলো গোপনে দালালরা সাপ্লাই দিয়ে যায়। সতুকে দেখতে পেয়ে রতি বলে, 'বেঁচে গেলাম সতু। আজ রাত্রেই রওনা হচ্ছি। লণ্ডন হয়ে চার তারিখে নিউ ইয়র্ক পৌছুতে হবে। বেরুটে হয়তো ঘণ্টা বারো থাকতে হবে। সেখান থেকে কয়েকটা ডলার কিনে নেব।'

সতুর আওয়াজ শুনে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল রতিলালের বউ, সুশীলা।

সতু বলল, 'এই যে ভাবী, আসুন। কী সাংঘাতিক বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। চৌরঙ্গীর জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছিল—'

'কেন?' জিজ্ঞাসা করল সুশীলা।

'আপনি এখনো শোনেন নি তা হলে।' রতিলালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সতুই জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে রতু, ভাবীকে বলিস নি বুঝি? বুঝলেন ভাবী, রতি আজ প্রচণ্ড মার খেয়েছে।'

রতিলাল উঠে পড়ল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,

'এখন থেকে টানা ছ ঘণ্টা মিটিং চলবে। চটকল, চা-বাগান, কটন মিল, লোহার কারখানা এবং আরো দু-চার রকমের ছোটখাটো ব্যবসার সকলেই এসেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা সব শেষ করতে হবে। পুরো জানুয়ারী মাসটা এখানে থাকব না। সুশীলা তোর যত্নআত্তি করবে। তা ছাড়া বহু নতুন নতুন উপন্যাস রয়েছে। এই ফরাসী উপন্যাসটা পড়িস—অদ্ভুত ভাল। সুশীলা- ডারলিং—সতু একটু লাজুক ছেলে। ভাল করে খাওয়াবে—'

'না, না, ওঁকে আবার ব্যস্ত করে তুলতে গেলি কেন। এতবড় একটা সংসার চালাচ্ছেন, তার ওপর এতোগুলো সন্তান- না, না, আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, ভাবী। তোর যেন ক'টা ছেলে-পুলে রে রতি?' প্রশ্নটা হঠাৎ যেন মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল ওর।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে রতিলাল বলে গেল, 'আমার হিসেব নেই। সুশীলাকে জিজ্ঞেস কর।'

'শুনলেন? শুনলেন আপনার বন্ধুর কথা?' রতিলালের অনুপস্থিতিতে সুশীলা সতুকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনার বন্ধুকে একটু সমঝে দেবেন—'

'সারা দুনিয়ার লোককে সমঝে দিচ্ছে রতি। আমার মতো লোক তাকে কি সমঝাবে, ভাবী?'

'তাই বলে কটি ছেলেপুলে তা সে জানবে না? ব্যাঙ্কে টাকার হিসেব রাখবে আর সন্তানের হিসেব রাখবে না? বলো সতুবাবু? এবার থেকে আমিও আমার নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলব। সাত-তলার চিলে কোঠায় গিয়ে বিছানা পাতব। অতো ওপরে উঠতে পারবে না রতিলাল।'

'ভাবী, রতু আজকাল নিয়মিত মাংস ডিম খায়। মাড়োয়ারীর পেটে পশু-প্রোটিন ঢুকেছে, এখন চোদ্দ তলায় উঠবে। আপনি এবার সংসারের কাজকর্ম দেখুন গে। আমায় বেলা ছ'টা নাগাদ

খাবার পাঠিয়ে দিলেই চলবে। আপনার আসবার দরকার নেই। এখন গীতা বৌদির সঙ্গে একটু ফাইনেনসিয়াল আলাপ আলোচনা করব। আমার এককালীন দু হাজার টাকা চাই।'

ফস করে সতুর পাশে ডিভানের ওপর বসে পড়ে সুশীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা বললে?'

'হাজার দুই।'

কোমরের খাঁজে গোটা ত্রিশ চাবি ঝুলছিল। চাবিগুলোতে দোলা দিয়ে সুশীলা বলল, 'দু হাজারকে তোমরাই শুধু টাকা বলো —তোমরা মানে, বাঙালী ওড়িয়া আর আসামীরা। দু হাজার রুপিয়া আবার টাকা নাকি? বাইরের লোকের কাছে চাইতে নেই। আমার যে একটা ছোকরা নোকর আছে তার কাছে পাঁচ-সাত হাজার সব সময়েই পড়ে থাকে। দু হাজারের জন্য আমার সিন্দুক ভি খুলতে হোবে না। দেখবেন?'

'আপনার ছোকরা নোকরটিকে আমি দেখে কি করব, ভাবী?'

'আরে কি যে বোলেন সতুবাবু, নোকর দেখবেন কেন, দেখবেন টাকা।'

লাস্যময়ীর মতো খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুশীলা।

ফরাসী উপন্যাসটার পাতা ওল্টাতে লাগল সতু। কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকবার কল্পনাটা ক্রমশই দানা বেঁধে উঠছে। এই ঘরটার মধ্যেও গণ্ডগোল রয়েছে। সুশীলা ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। মাড়োয়ারীর বউ বলে বেশিদিন আর দূরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। বালিগঞ্জ থেকে এখানে আসা যাওয়া করতে অসুবিধে হয় বলে রতিলাল বছর দুই আগে একটা আমেরিকান গাড়ি দান করে দিয়েছিল। গাড়িটাকে সঙ্গে করে পূর্ণ দাস রোডে নিয়েও এসেছিল সে। কথা ছিল গাড়িটা পৌছে দিয়ে ট্রামে চেপে ফিরে আসবে ড্রাইভার। গেটের ভেতর দিয়ে গাড়িটাকে ঢুকতে

দেখে গোপীমোহন দ্রুতবেগে নেমে এসেছিলেন নিচে। বাড়ির ভেতরে অতোবড় একটা মূল্যবান গাড়ি ঢোকাবার অর্থ কি? পাঁচ-জনের চোখে পড়লে ট্যাক্স আদাকারীদের কাছে কাল থেকেই উড়ো চিঠি পৌঁছতে থাকবে। সতু কি পাগল? গোল পার্কের কাছে নেমে যেতে পারত। তিনি মাড়োয়ারী না, মধ্যবিত্ত বাঙালী। যত রকম কায়দা করেই তুমি হিসেব করো না কেন, বাঙালীবাড়িব গেট দিয়ে অতো বড় একটা গাড়ি ঢুকতেই পারে না।

'বলছ কি বাবা? এই গাড়িটা রতিলাল আমায় উপহার দিয়েছে।'

'রতিলাল তোকে বাঈজী বলে ভুল করেছে।'

'বাঈজী? সেটা আবার কি?'

'যারা গান করে, নাচে, আর একাধিক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে।'

'নাঃ, রতু কখনো এতবড় ভুল করতে পারে না।'

'ব্লাডি ফুল! তোকে কেন সে একটা আমেরিকান গাড়ি উপহার দেবে? কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য না থাকলে এমন একটা অবিশ্বাস্য জিনিস কেউ কাউকে দেয় না। এমন কি পুত্রকে পিতাও দেয় না। ফেরৎ পাঠিয়ে দে—তাড়াতাড়ি কর। ঐ ছাখ্, এরই মধ্যে ছোঁড়ার দল গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। দেবি করলে ভিড় বাড়বে। পাড়ার লোকেরা ভুল করে ভাববে যে, গাড়িটা আমাদের। আমরা হচ্ছি গিয়ে ছাপোষা মানুষ। অতো মসৃণতা আমাদের সইবে না রে। গাড়ির দেহটার পালিশ দেখেছিস? এক নম্বর বাঈজীর চামড়াও এতো মসৃণ হয় না।'

অশ্লীল উপন্যাসটার পাতা উল্টে যাচ্ছিল সতু। পাতা ওল্টাচ্ছে আর চেয়ে চেয়ে ঘরের আসবাবপত্রগুলো দেখছে। দামী আর সুন্দর আসবাব। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কি ছিল সতু তা জানে না। কিন্তু এখন মাড়োয়ারীদের রুচি পাল্টেছে তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। এই বাজারেও বর্মা টিকের অভাব হয় নি। উত্তম জিনিস তৈরি করতে গেলে মশলাও উত্তম হওয়া চাই। ঘরের মেঝে জুড়ে দু ইঞ্চি পুরু িংব্বতী কার্পেট। পা ফেললে বেশ খানিকটা নিচু হয়ে যায়। জুতোর তলা থেকে মাথার চুলের গোড়ায় পর্যন্ত মসৃণতার আরাম অনুভূত হয়।

পাতা ওল্টাচ্ছে আর অশ্লীলতার পরিণতি খুঁজছে। পরিণতি বইয়ের প্রথমে কিংবা মাঝখানে থাকে না বলে অনেকগুলো পাতা বাদ নিয়ে চলে এল বইটার শেষের দিকে। নাঃ, সব পরিণতিই সেই একই ব্যাপারের মধ্যে এসে শেষ হয়ে যায়। নতুনত্ব কিছু নেই। তার চেয়ে বরং গীতা বউদিকে টেলিফোনে ধরা যাক। বেলা সাড়ে বারোটা। হয়তো বিছানায় শুয়ে শুয়ে পালং-চা খাচ্ছেন। বিনা স্বার্থে হাজার দুই টাকা তিনি দিতে পারেন কিনা পরীক্ষা করে দেখা যাক। সতুর এখন দুনিয়ার সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখবার বয়স। পরীক্ষা করতে করতে একদিন সে অভিজ্ঞ লোক হয়ে উঠবে। মানুষের মনোজগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা সে চোখ বুঁজেই দেখতে পারবে। বাবা বলেন, 'সতু, পঁচিশ বছর হল এখনো তুই নাবালক।'

এসব কথার জবাব দেয় না সত্যপ্রকাশ। মনে মনে শুধু হাসে। সতুর বিশ্বাস, বাঙালীরা জন্ম থেকেই সাবালক। সেই জন্যই এদেশে শিশু সাহিত্যের বৃদ্ধি হল না।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল হাতে, এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। তারপর সাহস সঞ্চয় করে ডাকল, 'হ্যালো, হ্যালো —'

এইমাত্র ঘুম ভাঙল গীতা মিত্রের। গতকাল ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছিল। বিছানার পাশেই হাতীর দাঁতের তৈরী টি-পয়ের ওপর কালো রঙের রিসিভার। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন হাতে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন এল বলে তিনি ভাবলেন, বছরের শেষ দিনটা ভাল কাটবে তাঁর। রাত

বারোটার পরেই নতুন বছর আরম্ভ হবে। সূচনাটা মঙ্গলজনক। টেলিফোনে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে ডাকছে। গলার স্বরটা চেনা চেনা।

'হ্যালো—কে? ঠাকুরপো? সতু?' চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন আবার। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে লম্বাভাবে এক অংশ দিয়ে অন্য অংশকে পেষণ করতে করতে গীতা মিত্র বললেন, 'এ তোমার ভা-রি অন্যায় ঠাকুরপো। গতকাল দুপুরবেলা আসবে বলেছিলে—'

'কি করব বলো, গতকাল দুপুরবেলা পণ্ডিতিয়া রোডে গিয়েছিলাম। বউদির ওখানে। সেখানেই দুপুরটা কাটল।'

'হ্যালো সতু, সেখানে কি করছিলে?'

'বউদির মাথার পাকা চুল বেছে দিচ্ছিলাম। জানো, কটা তুললাম?'

নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে গীতা মিত্র বললেন 'ঠাকুরপো, তুমি ভা-রি অসভ্য। অমন সুন্দর আর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো বুঝি অন্য কোনো মহত্তর কাজে লাগাতে পারলে না?' রিসিভারটা থুতনির সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন মিসেস মিত্র। এবার তিনি সেটাই বাম বক্ষের ওপর সজোরে স্থাপন করে বললেন, 'আজ দুপুরবেলা এখানে চলে এসো, ঠাকুরপো। সময় কাটে না বলেই তো ক্লাব-হোটেলে যাই। তোমার সঙ্গ পেলে কোথাও আর যাব না। এখুনি চলে এসো, আমার সঙ্গে বসে লাঞ্চ খাবে। চর্বিওয়ালা মুরগী আর মটন আছে—'

'না বৌদি। আমি এখন ফলমূল খেয়ে দিন কাটাব ভাবছি।'

'কেন?'

'কলকাতার অবস্থা এমন এলোমেলো হয়ে উঠেছে যে চিত্তচাঞ্চল্য দমন করে রাখতে চাই। ভাবছি এখন থেকে কয়েকটা বছর শুধু ফলমূল খাব আর কবিতা লিখব।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সতু।

'সুন্দর স্বাস্থ্য তোমার ঠাকুরপো। এই বয়সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে কেন? তোমার দেবদা তো অকর্মণ্য—থলথলে দেহ নিয়ে শ্বাস ফেলতেই তার কষ্ট হয়। ভাবছি পালিয়ে যাব—বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনব—জহরলাল নেহেরুকে ধন্যবাদ।'

'তিনি তো মরে গিয়েছেন বৌদি!'

'বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনটা পাশ করে তবে মরেছেন। মরবার আগে ভারতবর্ষের কোনো নেতাই এতবড় কীর্তি রেখে যেতে পারেন নি। কখন আসছ, ঠাকুরপো? রাত আটটায় মিস্টার খান্নার বাড়িতে আজ হৈ-হুল্লোড় শুরু হবে। তাঁর কোম্পানি অ্যাকাউন্টে খরচ চলে—হ্যালো, বেশ, বিকেল চারটে নাগাদই এসো। হ্যালো, কি বললে, হাজার দুই টাকা চাই? নিশ্চয়ই দেব। ও তো আমার হাতের ময়লা, সতু। চেক লিখতেই হবে না, ঘরের এদিক ওদিকে খুঁজলেই হাজার দুই পাওয়া যাবে। চারটের সময়ই এসো। আমি তখন প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তোমার কাছে আমার গোপন করবার কিছু নেই। তোমাকে আমি দেখাতে চাই, আকর্ষণ করতে চাই—তোমাকে আমি সব কিছু দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। হ্যালো, তুমি সুখ পাবে, সুখী হবে। দোতলায় উঠে বাঁ দিকে মোড় ঘুরবে। লম্বা বারান্দাটা শেষ হওয়ার আগে ডান দিকে সরু একটা করিডোর দেখতে পাবে। সেটা পার হয়ে এলে ডান দিকে দেখবে দরজার গায়ে একটা মিশ্রিত রঙের পর্দা ঝুলছে। বাইরে বসে ডিউটি দিচ্ছে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। বিউটি এক্সপার্ট। তুমি যতক্ষণ না আসছ ততক্ষণ তাকে আমি বাইরে বসিয়েই রাখব। দরজার এক কোণায় দেখবে সিঁদুরের ফোঁটার মতো একটা বোতাম। আঙুল দিয়ে একটু খোঁচা মারলেই আমার শয়ন-কামরার দরজাটা নিজে থেকে খুলে যাবে—তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে থাকব—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো, ঠাকুরপো…'

লাইনটা কেটে দিতে যাচ্ছিল সতু। তারপর হঠাৎ মনে হল যে,

টাকার ব্যাপারটার কোনো মীমাংসা হয় নি। আরো একটু গীতা বউদিকে বাজিয়ে দেখা যাক। অশ্লীল উপন্যাস যদি পড়া যায় তাহলে দু-দশটা অশ্লীল কথা শুনলে দোষ কি?

'হ্যালো বউদি, তাহলে হাজার দুই টাকা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারবে কি?'

'লোক দিয়ে? কেন, তুমি নিজে আসতে পারবে না?'

'একটু ব্যস্ত আছি।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করছ? হ্যালো—'

'রতিলালের প্রাইভেট শয়ন-কামরা থেকে।'

'মানুষের শয়ন-কামরা আবার পাবলিক হয় নাকি?'

'না, তা নয়। মানে এখানে রতিলাল বউয়ের সঙ্গে শোয় না—মানে এই ঘরটাতে সে বিশ্রাম করে। অবিশ্যি সুশীলা ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ঢুকে পড়তে পারে—হ্যালো—'

'সুশীলার বয়স কত ঠাকুরপো?'

'দেখলে মনে হয় রতিলালের চেয়ে বড়।'

'তার চুল পাকে নি ঠাকুরপো?'

'মাড়োয়ারী বউয়ের কথা ছেড়ে দাও। ঠিকুজি অনুসারে মাত্র কুড়ি বছর বয়স। এই বয়সের মধ্যে পাঁচ-ছটা বাচ্চা পয়দা করলে তার কোনো কিছুই তো কাঁচা থাকবার কথা নয়। সেই জন্যই রতিলাল ব্যবসার নাম করে পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়—হ্যালো বউদি—আমি নিজে যদি না যাই তাহলে কি টাকাটা আমায় দেবে না?'

'পুরুষ মানুষের এতো ভয় থাকতে পারে আমি তা জানতুম না। হ্যালো ঠাকুরপো, দেখি, আজ আবার বছরের শেষ দিন, কে কোথায় থাকবে জানি না। লোক একটা খুঁজে বার করতে হবে। সন্ধ্যে-বেলা কোথায় থাকবে তুমি?'

'পণ্ডিতিয়া রোডে।'

'ঠাকুরপো, তুমি কেন আমার মাথার পাকা চুল বেছে দাও না?'

'হ্যালো—কি বললে? তোমার মাথার পাকা চুল বেছে দেব? বাজে কথা বলো না। তোমার অমন ঘন কালো চুল। এতো তাড়াতাড়ি পাকতেই পারে না। বাবা তোমার কত সুখ্যাতি করেন। বলেন, তুমি বাংলা উপন্যাস কিংবা ফিল্মের চরিত্রই নও। দু কোটি বাঙালী মেয়েদের মতো চরিত্র তোমার ফ্ল্যাট নয়। এ চরিত্র ফিল্মের পর্দায় ফোটাতে হলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিরেক্টার চাই। বাবার কথা মিথ্যে নয়। এদেশে তোমাকে পাওয়া যায় না. হ্যালো—'

'হ্যালো, কোথায় তাহলে পাওয়া যায়, ঠাকুরপো?'

'বোধহয় আমেরিকায়।'

ওপাশ থেকে টেলিফোনটা কেটে দিলেন গীতা মিত্র।

দুপুরবেলা বাড়িতেই ছিল পরিমল। তারও শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়ার কথা ছিল। শরীরটা ভাল নেই। হার্টের ওপর আক্রমণ হওয়ার পর থেকে পুরনো স্বাস্থ্য আর ফিরে আসেনি। বাইরে থেকে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন প্রায় তিন টাকার ওষুধ খেতে হয়। আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে পরিমল।

আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে ভেবেই তো সে আদর্শের পথটা বেছে নিয়েছিল। আর্থিক ও রাজনৈতিক দুটো সংগ্রামের জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল সে। কিন্তু তখন ভাবতে পারেনি যে এই ধরনের একটা মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ তাকে সহ্য করতে হবে। কি বিশ্রী ব্যাধ! এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত বোধ করা যায় না। একা একা হাঁটতেও ভয় করে। গতকাল সার্কুলার রোড ধরে পার্টি-অফিসে যাচ্ছিল। মস্তবড় একটা ছাপাখানার সামনে এসে হঠাৎ ফুটপাতের ওপর বসে পড়েছিল পরিমল। গেটের বাইরে তখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল ছাপাখানার শ্রমিকরা। সাহেবদের

ছাপাখানা ওটা। চল্লিশটা ভাষায় ছাপার কাজ হয়। তবু শ্রমিক-দের পেটের খিদে মেটে না।

বুকের ওপর হাত চেপে দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়েছিল সে। ছুঁচ ফোটার মতো বুকের ভেতর ব্যথা অনুভব করছিল। দেয়ালটার গায়ে লাল কালির পোস্টার পড়েছে। গোটা কয়েক দাবির কথা লেখা ছিল তাতে। বোধহয় পৃথিবীর সব কটা অনুন্নত দেশের দেয়ালেই লাল কালি দিয়ে দাবিগুলো লেখা রয়েছে। কিন্তু লিখিত দাবি কি মঞ্জুর হয়? অনুন্নত দেশগুলির ইতিহাস সে জানে। কালি কলমের সঙ্গে সঙ্গে গুলি বন্দুকও চলেছে। পোস্টারের ওপর হাত রেখে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছিল পরিমল। প্রায় দিন পনেরো নখ কাটা হয়নি। নখের খোঁচা লেগে পোস্টারের খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে দশ বারোজন শ্রমিক ছুটে এসে পরিমলকে মারতে শুরু করে দিয়েছিল। মস্তবড় ফাড়া গিয়েছে কাল। শ্রমিকরা ওকে বলেছিল, 'আমেরিকার গুপ্তচর'। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় লোয়ার সার্কুলার রোড! মার খেল পরিমল। ওকে ঘেরাও করে রেখেছিল ছাপাখানার শ্রমিকরা। হয়তো আর দু-চারটে লাথি কিংবা ঘুষি মারলে মরেই যেত সে। তারপর সামনে এসে উপস্থিত হল যতীন দাস। ইউনিয়ানের সেক্রেটারী। পরিমলকে চিনত সে। ভিড় ঠেলে পরিমলকে বাইরে নিয়ে গেল—এগিয়ে দিয়ে এল পার্টি অফিস পর্যন্ত। ক্ষমা চাইল বার বার করে।

আজ আর তাই বাড়ির বাইরে যায়নি। বিশ্রাম করছে। সকাল থেকেই ওষুধ খেতে হচ্ছে। কালকে মার খাওয়ার জন্য ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হয়েছে। আজকে আর শুধু তিন টাকার ওষুধে কুলিয়ে উঠবে না। দুর্ভাবনার সংখ্যা একটা বাড়ল।

মিছিল নিয়ে বান্টু বেলা এগারোটা থেকেই পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাওয়ার আগে শুধু আলু সেদ্ধ আর ভাত খেয়ে গিয়েছে। খাওয়ার আগে বান্টুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিমল ওর পকেটে চার

আনার চীনা বাদাম দিয়ে দিয়েছিল। পথ চলতে চলতে খিদে পাওয়াই স্বাভাবিক। একে বয়স কম, তার ওপর শীতকাল বলে বান্টুর আজকাল খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু পরিমলের অনেকদিন ধরে মাইনে বাড়ে নি। বামপন্থীরা যদি নির্বাচনের পরে শাসনভার পায় তাহলে হয়তো প্রাইভেট ইস্কুলের শিক্ষকদের মাইনে খানিকটা বাড়তে পারে। পরিমলের চিন্তার কোনো শেষ নেই। থিয়োরেটিকেল চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিকেল চিন্তাও করতে হচ্ছে ওকে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে যে সুনন্দার জন্য একখানা শাড়িও কেনা হয়নি সে কথাটা আজকাল প্রায়ই মনে করে সে। শেষ শাড়িটা কবে যে কেনা হয়েছিল....হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগে, পূজো শেষ হওয়ারও দিন ছ-সাত পরে শাড়িখানা পরিমল নিজেই কিনেছিল। ছ-সাত দিন পরে কিনেছিল বলে দামও একটু কম পড়েছিল। সুনন্দা সেলাই করে করে আর তালি লাগিয়ে যে পুরনো শাড়িগুলো পরছে পরিমল তা জানে। নিজে থেকে সুনন্দা আজ পর্যন্ত শাড়ি কেনবার কথা বলেনি। বোধহয় সেই কারণেই কারো বাড়িতে গিয়ে সুনন্দা কখনো সামাজিকতা রক্ষা করতে চায় না। একজন ধনী কমিউ-নিস্টের মেয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য ভদ্রলোকটি খুবই পেড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেনি। পরের করুণা উদ্রেক হতে পারে ভেবে সুনন্দা কোথাও যায় না। নিজের জীবনের সবটুকু আশা আকাঙ্খা এখন শুধু বান্টুর ওপরেই নির্ভর করছে।
ইস্কুলে পড়ে না বান্টু। সত্যি কথা বলতে কি, সুনন্দার বিশ্বাস, মাইনে দিয়ে পড়াবার মতো কলকাতায় একটা ইস্কুলও চোখে পড়ে না ওর। সেইজন্য গোড়া থেকে নিজেই বান্টুর শিক্ষার ভার নিয়েছিল। আর একটু বয়স বাড়লে পরিমলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করবে। বান্টুর এখন থিয়োরেটিকেল আর প্র্যাকটিকেল দু রকমের শিক্ষাই হচ্ছে। প্রথমটা ঘরে, দ্বিতীয়টা কলকাতার পথে আর মাঠে-ময়দানে। তৈরি হচ্ছে বান্টু।

ছেষট্টি সাল প্রায় শেষ হয়ে গেল। বিকেলের নরম রোদ পড়েছে দাওয়ায়। বস্তিটার ঘন সন্নিবিষ্ট ঘরগুলোর ফাঁক দিয়ে বেলা চারটের সময় প্রতিদিনই পরিমলের ঘরের দাওয়ায় এই রোদটুকু এসে প্রায় ঘণ্টাখানেক টিঁকে থাকে। পুরো দাওয়াটা আলোকিত না হলেও একটা দিক আলোকিত হয়। পশ্চিম দিকের একজোড়া নারকোল গাছের জন্যই সূর্যের কৃপা থেকে দাওয়ার অর্ধাংশটা বঞ্চিত হয়েছে। তা হোক, বাকী অংশটায় সুনন্দা চাদর মুড়ি দিয়ে চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শুয়ে থাকে। রোদ উপভোগ করে ঘুমোয় কি না পরিমল তা জানে না।

বোধহয় আদর্শের রোদে গা এলিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে!

ঠিক সাড়ে চারটেব সময় গোপীমোহন এসে উপস্থিত হলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই ডাকলেন 'বউমা, ও বউমা, ঘুমোচ্ছ না কি?'

'না বাবা—আসুন। এ কি করেছেন? সত্যিই কিনে ফেলেছেন দেখ্ছি!'

বান্টু একটা জ্যান্ত পাঁঠা কিনতে বলেছিল—' পাঁঠাটাকে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে একেবারে দাওয়ার সামনে এনে উপস্থিত করলেন গোপীমোহন। তারপর দাওয়ার বাঁশের খুঁটিটার সঙ্গে বেঁধে রেখে বললেন, 'আমি আসছি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এক হাতে একটা সরষের তেলের টিন আর অন্য হাতে বটগাছের ডাল নিয়ে এসে সুনন্দাকে বললেন, 'যতক্ষণ না এটাকে বলি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ প্রাণ ভরে বটপাতা খাক। বউমা, একটা পাঁচ কেজি তেলের টিনও নিয়ে এলাম। ঘরে আলু পেঁয়াজ, আদা, রসুন এসব আছে তো। এমন এক সময় ছিল যখন সরষের তেল দিয়ে মাংস রান্না করলে পরিমল খেত না। খাঁটি গাওয়া ঘী ব্যবহার করতে হতো। এখন ওর হার্টের যা অবস্থা তাতে খাঁটি গাওয়া ঘী কিনতে ভয় পেলাম। এই নাও বউমা—

ধরো, এটা রেখে দাও।' এক প্যাকেট সিগারেট সুনন্দার হাতে দিয়ে বললেন, 'পরিমলও কি মিছিলে বেরিয়েছে?'

'না। ওর শরীরটা ভাল নেই।'

'কি হয়েছে?'

'গতকালই শরীর খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। পার্টি অফিসের একজন কমরেড বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।'

'দ্যাখো বউমা'—দাওয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে গোপীমোহন বললেন, 'দ্যাখো বউমা, ওর যা অসুখ তাতে পরিমলের একজন সাধারণ কর্মী হয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব।'

'তা হলে?'

'ওকে লীডার হতে হবে। ওকে লীডার হতে বলো। আজ উঠি—বান্টুই কেটেকুটে দিতে পারবে। হ্যাঁ বউমা, ঐ ছোঁড়াটা কি রোজই এখানে আসে?'

'কার কথা বলছেন?'

'সত্যপ্রকাশের কথা।'

'না, রোজ আসে না।'

এই সময় পরিমল বাইরে বেরিয়ে এসে বলে, 'বাবা, তুমি আজ আমাদের এখানে রাত্তিরে খাবে? সুনন্দার হাতের রান্না তোমার খুব পছন্দ হবে। তোমার মতো সুনন্দাও ছেলেবেলা থেকে পশু প্রোটিন ছাড়া অন্য কিছু খেতে চায় না।'

'সেইজন্যই তো বান্টুর মতো একটি তেজী সন্তানের মা হতে পেরেছে। নিরামিষাশীদের হাতে ভারত রাষ্ট্র কখনো নিরাপদ হতে পারবে না। পৃথিবীর তেজী তেজী শাসকরা কেউ নিরামিষাশী নন। ভারতবর্ষের হিন্দুরা সেইজন্যই হেরে গিয়েছে, হারছে এবং হারবে। কিন্তু আজ রাত্তিরে তো খাওয়া চলবে না। ছেষট্টির শেষ দিন আজ। রাত বারোটার পরে নতুন বছর আরম্ভ হবে। এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে। অন্য একদিন হবে—'

'একদিনও তো খেলে না, বাবা? আমাদের কি ঘেন্না করো?'

'তা হলে আর আসব কেন? এখন ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় বান্টু ছাড়া আমার আর ডাইরেক্ট ওয়ারীশ কেউ থাকবে না। অন্ততঃ আমি দেখে যেতে পারব না। সতুর কথা বলছিস? ও একদিন উন্মাদ হয়ে যাবে। প্রতি মূহূর্তে শুধু সত্য সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। ওর মা যে কী সর্বনাশ করে গিয়েছেন তা আমিই শুধু বুঝতে পারছি। এই যুগে কেউ কি সন্তানের নাম সত্যপ্রকাশ রাখে? আচ্ছা বউমা, তুমি কেন ছোঁড়াটাকে পার্টির আদর্শে দীক্ষিত করো না? তাহলে তো চিন্তা ও কাজকর্মের মধ্যে খানকটা ডিসিপ্লিন আসত। মানুষ হতে পারত। আমি চলি।'

উঠে পড়লেন গোপীমোহন। কথাটা আবার নতুন করে বলতে লাগলেন। সুনন্দা কেন সতুকে দীক্ষা দিতে পারেনি? তবে কি সুনন্দা তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে? কম্বল সে ছেড়েছে কিন্তু কম্বল তাকে ছাড়ছে না বলেই কি বাধ্য হয়ে বান্টুকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কলকাতার মাঠে ময়দানে?

সুনন্দাও গোপীমোহনের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এল। গাড়ির কাছে এসে সুনন্দা বলল, 'মিনিট দশ বসলেই আপনাকে এক পেয়ালা চা আমি তৈরি করে দিতে পারতুম।'

'না বউমা, আজ বড় ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই। বান্টুদের শোভাযাত্রার মতো আমিও আজ উদ্দেশ্যহীনভাবে কয়েক ঘণ্টা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওদের তো এক পয়সাও খরচ হয় নি, আমার পেট্রল পুড়ল।'

সিগারেট বার করলেন গোপীমোহন, একটা সুনন্দার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বান্টু আজ আহত হয়েছে।'

বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে আহত হল?'

'বিক্ষুব্ধ জনতা একটা কোটিপতি মারোয়াড়ীকে পেটাচ্ছিল খুব।

কিল, ঘুষি, লাথি যে যা পেরেছে তাই চালিয়েছে।' খুক খুক করে হেসে উঠে গোপীমোহনই বললেন, 'বান্টু গিয়েছিল সেই মারোয়াড়ীটাকে রক্ষা করতে, আমি তো অবাক, বউমা। আমার ধারণা ছিল কোটিপতিদের লোপ করবার জন্যেই শ্রীমান বান্টু দয়া করে পৃথিবীতে জন্মেছে।'

'যেদিকে সত্য সেদিকেই বান্টুরা থাকবে বাবা। এর মধ্যে জাত কিংবা জাতি বিচার নেই;' মন্তব্য করল সুনন্দা।

গাড়ির দরজা খুলে গোপীমোহন বললেন, 'বছরের শেষদিন আজ। চলি, বাড়ি যাই। একটু বিশ্রাম করে আবার আমায় বেরুতে হবে। একটু আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা হয়েছে—আচ্ছা বউমা, পরিমলকে একবার জিজ্ঞেস ক'রো তো চীনারা আবার যাত্রা শুরু করবে কবে?'

'ওরা যাত্রা শুরু করেছিল নাকি?'

'সেই কথাই তো বলছি। বরফের রাজ্যে তাঁবু টাঙিয়ে ব্যাটারা করছে কি। হঠাৎ কেন অগ্রগতি বন্ধ করে দিল? মীমাংসাটা কি উত্তরকালের জন্য স্থগিত রেখেছে? বান্টুরা পুরোপুরি তৈরি না হলে বোধহয় আর এগুবে না। পরিমলকে একবার জিজ্ঞেস করো।'

'আপনি জিজ্ঞেস করলে ভাল হয়।'

'তা হলে বলি শোনো বউমা। ক'দিন আগে ওর সঙ্গে সেই আলিমুদ্দীন লেনের মুখেই দেখা হয়ে গিয়েছিল—আমি যদি একটু অন্যমনস্ক থাকতুম তাহলে ওর পেটের ওপর দিয়ে গাড়িটা পার হয়ে যেত। কোথা থেকে হঠাৎ বিপ্লবী সন্তানটি আমার সামনে এসে পড়েছিল—হাসছ যে বউমা?'

'বত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়ি—'

'ভাবছ পরিমলের পেটের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলেও মরত না সে?'

'পরিমল হয়তো মরে যেত, কিন্তু আমাদের আদর্শটা মরত না।

ইতিহাস খুললেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনি তো আমাদের আদর্শটাকেই খুন করবার কথা ভাবছিলেন।'

'ছি ছি—' নাটকীয় ভঙ্গীতে ছি-ছি কথাটা আরো বার কয়েক উচ্চারণ করলেন তিনি।

সুনন্দা বলল, 'পরিমল বলে আপনি নাকি ওর পিছু পিছু ঘুরে বেড়ান। প্রায়ই আলিমুদ্দীন লেনের মুখে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আপনার তো পার্টি অফিস থেকে সহস্র মাইল দূরে থাকবার কথা।'

প্রসঙ্গটার মধ্যে ঢুকতে চাইলেন না গোপীমোহন। এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'যাক গে, বত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়িটাকে নিয়ে তোমরা যত ইচ্ছে ঠাট্টা করতে পার—আমি তাতে আঘাত পাব না। গাড়ির ব্রেকটা খুব ভাল। প্রাণপণে ব্রেক কষলাম। আমার গাড়িটা চেনে বলেই পরিমল আমার দিকে দৃষ্টি দিল না। রাস্তাটা পার হয়ে গেল। পরিমল আমার প্রথম সন্তান বউমা—খুবই লাগল আমার। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আমিই ওকে ডাকলাম। মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু গাড়ির ওপর দিয়ে সে চেয়ে রইল উল্টোদিকের সেই জোড়া গির্জাটার দিকে।'

'বোধহয় গির্জার ঘড়িতে সময় দেখছিল।'

'তাই বলে বাপের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখবে না? পৃথিবীর অন্যান্য সন্তানরা বুঝি রাজনীতি করে না? যাক গে বউমা। আমিই ওকে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে কমরেড, বলতে পারিস চীনারা আর কত দূরে এগুবে? বউমা, ধীর স্থির আর শান্তকণ্ঠে পরিমল পাল্টা প্রশ্ন করল: 'চীনারা যাত্রা করল কবে?' আমার কথা শোনবার জন্য এক সেকেণ্ডও আর অপেক্ষা করল না। হনহন করে হেঁটে চলে গেল গলিটার দিকে।

'গলির মধ্যেই আমাদের পার্টি অফিস। বোধহয় জরুরী কাজ ছিল।'।

'কাজ শুধু কমরেডদেরই থাকে তেমন যুক্তি বিশ্বাস আর কে করে, বউমা? ওরা শুধু কাজ করে, স্নেহ-ভালবাসার ধার ধারে না। চলি—বাণ্টুর দিকে একটু নজর রেখো। আমার একমাত্র ওয়ারীশ। আজ মাথা ফেটে গিয়েছে। বউমা, বাটু আগে তোমার সন্তান, পরে কমরেড্।'

গাড়িতে উঠে বসলেন গোপীমোহন। গলিটার মধ্যে আলো আর নেই। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। সিগারেটটা ছু আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে রেখেছিল সুনন্দা। টানতে ভুলে গিয়েছিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে গোপীমোহন বললেন, 'বউমা, একটা কথা তোমায় বলছি, রাগ ক'রো না।'

'রাগ করব কেন, বলুন।'

'তুমি সকলের আগে বাণ্টুর মা, তারপর কমরেড।'

গাড়িটা গলি থেকে বার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হেঁটে ঘরের সামনে চলে এল সুনন্দা। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। পরিমল ঘুমচ্ছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকারের ঘনত্ব খুব বেশী। সুনন্দার মনে হল, এতো বেশী অন্ধকার আগে কখনো সে দেখে নি। হঠাৎ যেন ঘরের ভেতর থেকে বুকের ওপর ভর করে দাওয়ার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে বাণ্টু! এ কোন্ বাণ্টু? সুনন্দা তাকে নিজের সন্তান বলে চিনতে পারছে না। মুখটা ঠিক মানুষের মতো নয়, চোখ ছুটো জ্বলন্ত উনোনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাথার ছু-দিকে ছুটো শিঙ গজিয়েছে। শাণিত তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ—খোঁড়া পা-টা টান হয়ে গিয়েছে। সজারুর কাঁটার মতো ওর সারা গায়ে নানা রকমের অস্ত্র গোঁজা। মুহূর্তের জন্য কেমন যেন হকচকিয়ে গেল সুনন্দা। মনে হল, পূর্ববঙ্গের সেই সুড়ঙ্গটার দিকে পথ ধরেছে বাণ্টু। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অন্ধকারের আব্রুটাকে খোঁচা মারতে মারতে এগিয়ে চলেছে সে। পেছনে দাঁড়িয়ে কে?

মাষ্টারমশাই না কি? তাঁর তো দাড়ি ছিল না। বিপ্লবের দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। অতীত আর বর্তমানের মাঝখানে একটা হাইফেনের মতো লেগে রয়েছেন মাষ্টারমশাই। তবে কি স্বাধীন ভারতের ঘনারণ্যে ভোল পাল্টে গিয়েছে তার? থরথর করে কাঁপতে লাগল সুনন্দা।

ভেতর থেকে পরিমল ডাকল, 'সুনন্দা।'

'আসছি।'

'বুকের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে।'

ঘরে আজ ওষুধ ছিল না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভেতরে প্রবেশ করল সুনন্দা। আত্মসংযমের প্রাচীরটা ভেঙে পড়ল আজ। স্বামী আর সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠার আর শেষ নেই।

সন্ধ্যার একটু পরেই রতিলালকে দমদম পৌঁছে দিতে হবে। সারাটা দুপুর ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি। ভারতবর্ষের বহু জায়গা থেকে ম্যানেজাররা উড়ে এসেছে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। এক মুহূর্তও বিশ্রাম পায় নি। রতি বলেছিল যে, দমদম যাওয়ার পথে ওর সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা বলে নেবে।

সুশীলা কোনদিনও ওকে তুলে দেওয়ার জন্য দমদম যায় না। আজ সে যাবে বলে ঘোষণা করে গিয়েছে। দুপুরবেলা বার কয়েক এসে সতুকে সাবধান করে বলে গিয়েছিল সে, 'বন্ধুকে তোমার বলে দিয়ো সতুবাবু, আমিও উড়তে জানি। আমার হাতেও দু তিন লাখ জমে গিয়েছে।'

'দু-তিন লাখ নিয়ে আর কত ওপরে উঠতে পারবে, ভাবী?'

'যতদূর পারা যায়। সমঝে দিয়ো তোমার বন্ধুকে।'

প্রায় ছটা নাগাদ তৈরি হয়ে গেল রতিলাল। তার আগে সত্যপ্রকাশ একটা কবিতা লিখে ফেলল। কবিতাটা লিখল সুশীলাকে নিয়েই। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই ভারতবর্ষের বহু মেয়ে

কি করে যে তিন কুড়ি বছরের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে সেটাই হল ওর কবিতাটির বিষয়বস্তু। লেখবার পর কবিতাটা আর দ্বিতীয়বার পড়েনি। ভাঁজ করে পাঞ্জাবীর বুক পকেটে রেখে দিয়েছে।

গাড়ীতে উঠে রতিলাল আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। আগে থেকেই একটা কোণা ঘেঁষে সুশীলা বসেছিল গাড়িতে। উঠতে গিয়েও উঠল না। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে চেয়ে বলল সে, 'কী সৌভাগ্য আমার! সুশীলা আমায় দমদম পৌঁছে দিতে চলেছে! সতু, তুই ওঠ—'

'আগে তুই উঠে যা।'

'না, না. তুই রোগা মানুষ, মাঝখানে বসে পড।'

সত্যপ্রকাশ রতিলালের গায়ে মৃদু একটা ধাক্কা মারল। তাতেই কাজ হল।

রতিলাল উঠে বসল মাঝখানে।

গাড়িতে উঠে সুশীলা বলল, 'দু-একদিন পরে গেলে ব্যবসার সাম্রাজ্যটা তোমার ভেঙে পড়ত না।'

বাইরের দিকে মুখ করে সিগারেট টানছিল রতিলাল। সুশীলার দিকে মুখ ঘোরাল না। জনাকীর্ণ কলকাতার পথের দিকে চেয়ে বলল সে, 'চার তারিখে আমায় নিউইয়র্কে পৌঁছতেই হবে। বেরুট-এ হয়তো পুরো একটা দিনই থেকে যেতে হবে আমায়। সেখান থেকে কিছু ডলার কিনে নেব।'

'চোরা বাজার থেকে?' রতিলালের গায়ের ওপর হেলে বসে প্রশ্ন করল সুশীলা।

'বেরুট আর হংকং দুটোই হচ্ছে খোলা বাজার। সুশীলা, তুমি কি আজকাল লেফটিস্টদের খবরের কাগজ পড়ছ? তোমাকে দেখছি লেখাপড়া না শেখালেই ভাল হতো।'

উসখুস করছিল সত্যপ্রকাশ। যাওয়ার আগে আবহাওয়াটা ঘোলাটে হয়ে উঠছে। আলোচনাটা অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সত্যপ্রকাশ সুশীলার দিকে ঝুঁকে বসল। তিন জনেই

পাশাপাশি বসেছে। সুশীলা মাঝখানে আর দুটি পুরুষ দুদিকে।

সত্যপ্রকাশ ঝুঁকে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে রতি, তোর সেই গাড়িটার কি হল?'

'কোন্ গাড়িটা?' রতিলাল তবু ভেতরের দিকে মুখ ঘোরালো না।

'ওই যে সকালবেলা জনতা এসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল'—

'ও, তাই তো—কি যে হল কেউ আমায় খবর দেয় নি।'

'সত্যি, কি বিচ্ছিরি ব্যাপার! বুঝলে সুশীলা, আমার ভাইপো বান্টু সেখানে উপস্থিত না থাকলে রতিলাল আজ ভীষণ মার খেত।'

'মারোয়াড়ীকে সবাই মারতে চায়—' মন্তব্য করল সুশীলা।

সত্যপ্রকাশ সুশীলার বাঁ উরুতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'না, না, এসব কি কথা। কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল জনতা যখন ক্ষেপে যায় তখন তাদের মনে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা কিছু থাকে না।' উরুর ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিতে গিয়ে সত্যপ্রকাশ দেখল সুশীলা ওর হাতটা চেপে ধরে রেখেছে। জোরজবরদস্তি কিছু করল না সে। ভাল ছেলের মত ওখানেই হাত ফেলে রাখল।

ডানদিক থেকে কোন সাড়া পেল না বলে বাঁ দিকে হেলে বসল সুশীলা।

দমদম পৌঁছবার পর এদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল রতিলাল। ম্যানেজার ক'টি তো এসেছেই, তা ছাড়া আরও বিশ-পঁচিশজন দর্শনপ্রার্থীও সেখানে অপেক্ষা করেছিল। রতিলালকে ঘিরে তারা নানা রকমের আলাপ-আলোচনা নিয়ে মত্ত হয়ে উঠল।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল সুশীলা। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার পর সতুর কাছে এসে বলল, 'সতুবাবু, চলো আমরা পালাই। এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

'প্লেনটা আগে ছেড়ে যাক, ভাবী—' অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল সত্যপ্রকাশ।

'কেন, তুমি কি প্লেন উড়তে কখনো দেখ নি ?'

'দেখেছি। কিন্তু রতিবাবুকে নিয়ে প্লেন উড়ছে তা কখনো দেখিনি।'

সতুর কথায় কান না দিয়ে সুশীলা ফস করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে রতিলালের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমরা তাহলে চলি— তুমি তো ভীষণ ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা এখানে অনর্থক সময় নষ্ট করবে কেন— সতু, সতু কোথায় গেল—' ভিড়ের মাঝখান থেকে সরে এসে রতিলাল বলল, 'এই যে সতু—নিউইয়র্কে পৌঁছে চিঠি দেব। পারিস তো দু-একটা কবিতা কপি রেখে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিস। বাজে কবিতা পাঠাস নে। হৃদয়ের ষোল আনা দরদ ঢেলে দিয়ে কবিতার পঙ্‌ক্তি সাজাতে হবে। সতু, এবার তুই সাবালক হ—কই, সুশীলা কোথায় গেল—সুশীলা, সুশীলা—এই যে এদিকে এসো'—সুশীলার মাথায় হাত রেখে রতিলালই বলল, 'সাবধানে থেকো। শ্রীরামজীর নাম করবে। সতু রইল, তাকে দিয়ে কাজকর্ম সব করিয়ে নেবে।'

'আমায় কি একটা জরুরী কথা বলবি বলেছিলি না, রতু ?' জিজ্ঞাসা করল সত্যপ্রকাশ।

'ঐ তো বললাম। ভাবীকে একটু সাহায্য করিস। মানে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে কাজকর্ম করে দিস।'

'বেশ তো, বেশ তো, ডাকলেই চলে আসব ভাবী। বিপদ-আপদ ঘটলে টেলিফোন করবে। আমি বাড়ি না থাকলেও খবর দিয়ে দেবে। যেখানেই থাকি দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার জন্য বাড়ি ফিরবই।' সাহায্য করবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করল সত্যপ্রকাশ।

ঝানু ব্যবসায়ীর মতো অর্থপূর্ণভাবে মৃদু হাসি ফুটিয়ে রতিলাল বলল, ' ডিলটা তা হলে ক্লোজ করেই গেলুম।'

সতু তবু বোকার মত বলে বসল, 'নিশ্চিন্ত মনে তুই চলে যা। কর্তব্য কাজে আমি কখনো অবহেলা করব না। আমার উপর তুই নির্ভর করতে পারিস, রতু।'

সুশীলাকে নিয়ে সত্যপ্রকাশ এক কোণায় দাঁড়িয়ে রইল। দর্শনপ্রার্থীরা রতিলালকে আবার ঘেরাও করে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল। তারপর বিদায় মুহূর্তটা যখন মাইকের মাবফৎ ঘোষণা করা হল তখন ওরা দেখল, রতিলাল অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল আন্তর্জাতিক জনতার মধ্যে।

ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল সত্যপ্রকাশ। বিরাট একটা পরিবর্তনের ঢেউ এসে ওকে যেন চঞ্চল করে তুলেছে। বাইরের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। হৃদয়ের তলা থেকে নতুন কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু রতিলাল কি মনে মনে ওকে ঠাট্টা করে? নিউ-ইয়র্কে বসে কবিতা পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করে গেল কলকাতার একজন কোটিপতি মারোয়াড়ী। কেমন একটা অ্যানটি ক্ল্যাইম্যাক্সের বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি কানের পর্দায় আঘাত করছিল সতুর।

গাড়ীতে উঠে বসল সে। কয়েক মিনিট কথা বলল না সুশীলা। উলটো কোণায় প্রকাণ্ড বড় একটা পাকা আতার মত আলতোভাবে সীটের ওপর পা গুটিয়ে বসেছিল সে। যেন ছুঁয়ে দিলেই ভেঙ্গে পড়বে বলে সন্দেহ করছিল সতু। রতুর কাণ্ড দেখে সে নিজেও ব্যথিত বোধ করছিল। বিদায়ের আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততাটুকু না দেখালেও পারত।

বিমানঘাটির সীমানা পার হয়ে এল। হঠাৎ সুশীলা পা নামিয়ে খাড়া হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখন কোথায় যাবে সতুবাবু?'

'তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যাব। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে—' কথাটা অসমাপ্ত রেখে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সত্যপ্রকাশ বলল, 'নাঃ,

আজ আর গীতা বউদির ওখানে গেলে কাজ হবে না। বছরের শেষ দিন আজ। এতক্ষণে কোনও হোটেলে গিয়ে ঢুকে পড়েছে নিশ্চয়ই। দাদা আর বউদি দুজনেই খুব মদ খায়। নাঃ, আমি বাড়ি চলে যাব। দু হাজার টাকার একটা চেক লিখে রেখেছে বউদি—'

'কেন?' সত্যপ্রকাশের দিকে এগিয়ে বসল সুশীলা।

'আমি ধার নিচ্ছি।'

'কি করবে টাকা দিয়ে।'

'কাল থেকে একটু স্বাধীন ভাবে বাস করতে চাই। হাজার দুই টাকা পেলে অনেকদিন অন্য কারও কাছে ধার চাইতে হবে না।'

'দু হাজার টাকা দিয়ে কদিন চলবে তোমার?'

'আলাদা ফ্ল্যাটে থাকব।'

'তুমি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছ নাকি?' সতুর গায়ের সঙ্গে ঘেসে বসল সুশীলা।

'নেব। বাবার সঙ্গে বাস করলে স্বাধীনতার বারোটা বেজে যায়। সাংঘাতিক লোক! কি খাব আর কখন কোন্ জামা কাপড় পরব তাও তিনি ডিকটেট করেন।'

'এটা কি কাপড় পরেছ আজ?' সতুর হাঁটুর ওপর থেকে পা-জামাটা ওপর দিকে টেনে ধরল সুশীলা।

'এটা রতুর পা-জামা। খদ্দরের। একটু ঢিলে, কিন্তু লম্বায় ছোট হয়েছে। ওর চেয়ে আমি দু ইঞ্চি বেশি লম্বা। সকালবেলা আমিও দু-চারটে ঘুঁষি খেয়েছি। কাপড়টা টেনে প্রায় খুলেই ফেলেছিল চৌরঙ্গীর জনতা। রতু বললে, 'যা দিনকাল পড়েছে তাতে আর ধুতি পরে কলকাতার রাস্তায় বেরুনো চলে না। খুব রিস্ক!'

'কিসের রিস্ক?' হাঁটুর ওপর হাত রাখল সুশীলা।

'কাপড়টা যদি খুলে নিত?'

'কি হত?'

'বা রে—'

'কেন, আণ্ডারওয়ার পরো না ?'

'আজ পরিনি। বাবাকে অ্যাভয়েড করবার জন্য তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ি থেকে।'

'তোমায় আমি কাল মার্কেটে নিয়ে যাব। তোমায় নতুন নতুন জামা কাপড় কিনে দেব। রতুর চেয়ে তুমি দু ইঞ্চি বেশী লম্বা। তার জামা কাপড় তোমার গায়ে লাগবে না—তোমার আঙুলগুলোও সাংঘাতিক লম্বা—'সতুর হাতের পাঞ্জাটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে এল সুশীলা, 'তোমাকে বাড়ি থেকে কটা দিন বেরুতে দেব না। সতুবাবু, বড় একা পড়ে গেছি। অত বড় বাড়ি, অতগুলো চাকর দারোয়ান - পাঁচ দশ হাজার টাকা তোমায় আমি দিয়ে দেব—তার জন্য চেক কাটতে হবে না আমায়। আমার ওখানেই কটা দিন থেকে যাও।' সতুর হাতটা নিজের ঘাড়েব ওপর দিয়ে টেনে এনে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিল।

আধুনিক বাংলা কবিতার পাঁচটি পঙ্‌ক্তির মত পাঁচটা আঙুলই দুবোধ্য নিষ্ক্রিয়তার জয় ঘোষণা করতে লাগল।

'আচ্ছা সতুবাবু. খিদে পেলে মানুষ কি করে ?'

'খায়।'

'আমি গত তিন মাস থেকে কিছু খাইনি।' রতিলাল আমার কাছে ঘেঁসেনি। খিদের সমস্যাটা কি করে মেটাই বল তো ?'

'চল একটা হোটেলে যাই—' সুশীলার পিঠের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি মাছ মাংস খাও ?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে খাই। সেইজন্য খেতে আরও ভাল লাগে। এই তো বাড়ি পৌছে গিয়েছি। আজ এখানেই খাওয়া দাওয়া কর। কাল তোমায় হোটেলে নিয়ে যাব।' সুশীলা তার নিজের হাতটা সরিয়ে নিল। অভিজ্ঞতা আছে বলেই বুঝতে পারল সতুকে সে

মাতিয়ে তুলতে পেরেছে। সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ছে সতুবাবুর।

সত্যপ্রকাশ বলল, 'আজ আর ওপরে উঠব না। কাল আসব।'

গেটের ভেতর দিয়ে গাড়িটা ঢুকে গেল। একজন দারওয়ান এসে দরজা খুলে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে ফিসফিস করে সুশীলা বলল, 'নেমে এস।' সতুর হাত ধরে টান মারল সে।

রতিলালদের দোতলাটা ভাল করে চেনে সত্যপ্রকাশ। কিন্তু তার ওপরের তলাগুলো ওর কাছে একটা হেঁয়ালীর মত মনে হতে লাগল। সুশীলার পিছু পিছু হেঁটে চলেছিল সে। গোটা কয়েক সরু, চওড়া, লম্বা এবং ছোট বারান্দা পার হয়ে এসে মস্ত বড় একটা ড্রইং-রুমে বসে পড়ল সতু।

সুশীলা বলল, 'এটা আমার প্রাইভেট ড্রইং-রুম। কি খাবে বল।'

'মাংস।'

কি কারণে গায়ের ওপর থেকে আঁচলটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে সতু তা বুঝতে পারল না। সুশীলা গিয়ে সামনের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল। মাংস খেতে চাওয়ার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারে নি সুশীলা। সুইচ টিপে টিপে গোটা কয়েক আলো নিবিয়ে দিল সে। শুধু মাঝখানের ঝাড়লণ্ঠনে একটা বাল্বই জ্বলতে লাগল।

হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটা নোটের তাড়া সোফার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে সুশীলা বলল, 'ওতে হাজার তিন আছে। তুমি এখানে বস। আরও নিয়ে আসছি। সিন্দুক উজাড় করে নিয়ে আসছি। সতুবাবু, মারোয়াড়ীর সিন্দুক লুট করবার এতবড় সুযোগ আগে কেউ কখনও পায়নি। তুমি সব নিয়ে যাও, স—ব।' স্খলিত বস্ত্রে সত্যপ্রকাশের পায়ের কাছে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে হুহু করে কাঁদতে লাগল সুশীলা। বলল সে, 'প্রায় এক বছর ধরে রতিলাল আমার সঙ্গে

সম্পর্ক রাখে না। রতুর পাটরাণী এখন নিউইয়র্কে থাকে। তপতী বসুকে তুমি চেন সতুবাবু?'

'চিনি।'

টাকার বাণ্ডিলটা পড়ে রইল সোফার ওপর। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সত্যপ্রকাশ। বাইরের বারান্দায় একটা চাকর দাঁড়িয়েছিল। সত্যপ্রকাশ বলল, 'রাস্তাটা আমায় দেখিয়ে দাও।'

একেবারে বাইরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে। গেটের তুদিকে গ্যাসলাইট জ্বালিয়ে তুজন ফুচকাওয়ালা ফুচকা বিক্রি করছিল। বড় রকমের একটা ভিড় জমেছে সেখানে। বন্দুকধারী দারওয়ানটা সেলাম করল ওকে। সত্যপ্রকাশ দেখল, দারওয়ানটা একসঙ্গে অনেকগুলো ফুচকা মুখের মধ্যে ভরে দিয়েছে বলে বিব্রত বোধ করছে।

গেটের সামনে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল সে।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন স্যার?'

'বালিগঞ্জ।'

'কোন্ দিকে?'

'পণ্ডিতিয়া রোডে চলুন।'

'পণ্ডিতিয়া রোড তো বেশ লম্বা স্যার—যেদিকটায় হাফ-গেরস্থরা থাকে সেদিকটায় যাবেন কি?' মুখ টিপে হাসল ট্যাক্সিওয়ালা।

'কি গেরস্থ বললেন?'

'আধা গেরস্থ। গুণগুণ করে বাংলা ফিল্মের একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ট্যাক্সিওয়ালা যেন তুল্‌কি চালে গাড়ি চালিয়ে চলল। ট্যাক্সির কোণায় হেলান দিয়ে বসে রাস্তার আলোয় কবিতাটি পড়বার চেষ্টা করতে লাগল সত্যপ্রকাশ। প্রথম লাইনটাতেই সুশীলার নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'চিনি। আগে আমারই বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল সে। তারপর গায়ে-গতরে ওর এতো চর্বি জমে গেল যে ছেড়ে

দিলাম। নগদ পয়সা ছাড়ব অথচ ষোল আনা সুখ পাব না—'
হঠাৎ সে বিনা কারণে বার কয়েক টিপে টিপে হর্ন বাজালো।

তারপর নিজের মনেই ট্যাক্সিওয়ালা বলে যেতে লাগল, 'শ-দেড়েক মাইল ট্যাক্সি চালালে দশ-বারো টাকা ট্যাকে গোঁজা যায়। মাগী পুরোটাই ছিনিয়ে নিত। ঘরের গিন্নী কচু-পোড়া খেত। ওকে কত করে দেন, বাবু?'

'কাকে?' ড্রাইভারের কোনো কথাই বুঝতে পারছিল না সতু।

'পণ্ডিতিয়া রোডের সেই হাফ-গেরস্থ মেয়েটাকে? আমি যা দিতাম তা দিয়ে আজকাল এই বাজারে পুরো গেরস্থ পাওয়া যায়। এখানেই নামুন বাবু।' ট্যাক্সি থামিয়ে দিল সে।

'কেন, ভেতরে যাও। রাস্তা রয়েছে।'

একটা বিড়ি ধরিয়ে ড্রাইভার বলল, 'মাগীর গায়ে-গতরে সাংঘাতিক তাকত, মশাই। ট্যাক্সির নম্বরটা সে চেনে। যদি দেখে ফেলে তাহলে আমার টুঁটি টিপে ধরবে। হাজার হলেও আমি বাঙালী, ট্যাক্সি চালাই, কতই বা আর আমার গায়ে জোর থাকতে পারে বলুন। শেষের তিন দিন টাকা-পয়সা কিছু সুশীলাকে দিই নি—বাকীতে চালিয়েছিলাম, স্যার।' দুদিকে ভয়ে ভয়ে দৃষ্টি দিচ্ছে আর ফুক্ ফুক্ করে বিড়িতে টান মারছে ড্রাইভার।

ব্যাপারটা এতো জটিল ঠেকল যে, গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সত্যপ্রকাশ। বাকী পথটুকু হেঁটে গেল সে।

বড়দা-র ঘরটা একেবারে রাস্তার ওপরে বললেই হয়। বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে বটে, কিন্তু বস্তিতে ঢোকবার রাস্তাটার ঠিক পাশেই। বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে। ওখানেই বারোয়ারী পুজো থেকে শুরু করে ছোটখাট বিয়ে-সাদিও হয়। বছরের মধ্যে ছ' মাসই প্রায় মাথার ওপরে প্যাণ্ডেল বাঁধা থাকে। আজ অবিশ্যি ফাঁকাই ছিল। দূর থেকেই সত্যপ্রকাশ

দেখল মস্তবড় একটা উনোন জ্বলছে সেখানে। ইট নিয়ে উনোন তৈরী করা হয়েছে। উনোনের ওপরে কড়াই চাপানো। বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উনোনের চারদিকে গোল হয়ে বসে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ শুঁকছে। বউদি মাংস রান্না করছিলেন। একটা আস্ত পাঁঠার মাংস রান্না করবার মতো বড়দা-র রান্নাঘর কিংবা ব্যবস্থা নেই।

সত্যপ্রকাশকে দেখতে পেয়ে সুনন্দা বলে উঠল, 'এই দেখ সতু, বাবা কী কাণ্ড করেছেন। সত্যি সত্যি একটা আস্ত পাঁটা এনেছেন।'

'বাণ্টু কোথায় বউদি ?'

'কলতলায় গিয়েছে হাত-পা ধুতে।'

'কে এসেছে, মা ? কাকু—কাকু নাকি ? বলতে বলতে বারোয়ারী কলতলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল বাণ্টু। বলল সে, 'কাকু আজ আর আমি তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব না। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। খুবই ক্লান্ত আমি। ডান পা-টা ব্যথাও করছে। কাকু, তুমি কিন্তু খেয়ে যেও—তুমি কিছু মনে ক'রো না—'

'না না, মনে করব কেন ? তুই তো সারাটা দিন কাজ করেছিস, আমরা কেউ কিছু করিনি। যা, তুই গিয়ে শুয়ে পড়।'

'কাকু, তোমার মাড়োয়ারী বন্ধুটিকে আমাদের মিছিলের ছেলেরা কেউ মারধোর করে নি—'

'জানি।'

'হঠাৎ রাস্তার দু-দিক থেকে লোকজনেরা ছুটে এসে গাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দিল। মা, মা গো, কী সুন্দর দেখতে গাড়িটা। কচি কলাপাতা রঙের প্রকাণ্ড বড় গাড়ি।'

'আমেরিকানরা ছাড়া এতো সুন্দর গাড়ি অন্য কেউ আর তৈরী করতে পারে না।' বলল সত্যপ্রকাশ।

'শুনেছি, ও-দেশের চাষী-মজুররাও এই ধরনের গাড়িতে চেপে

ঘুরে বেড়ায়।' দাওয়ার ওপর উঠে বাণ্টুই বলল, 'এমন একটা সুন্দর গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।'

'দুঃখ করিস নে বাণ্টু—একটা পুরো দেশই তো দাউ দাউ করে জ্বলছেরে—ভিয়েৎনামের আগুন কি তোর চোখে পড়ে নি? জিজ্ঞাসা করল সতু।

মাঝে মাঝে সুনন্দা ওদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছিল, 'তোরা এবার বাড়ি যা। কাল আসিস। নতুন বছরে এসে মাংস খেয়ে যাস।'

নতুন বছরের ওপর নির্ভর করতে পারছিল না কেউ। আঠার মতো লেপটে বসে রইল মাটির ওপর। বড়লোকদের প্রতিশ্রুতির যে কোনো মূল্য নেই তা এরা এই কচি বয়স থেকেই বুঝতে পারে। এদের কাছে পরিমল বড়লোক। সুনন্দা বড়লোকের বউ। বস্তির ছেলেমেয়েরা জানে যে, পরিমলবাবু কমিউনিস্ট, কিন্তু বড়লোক কমিউনিস্ট। এরাও কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের মতো শুধু ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একাধিক ফানুসগুলো ঝুলিয়ে রাখে চোখের সামনে। লাল লাল ফানুস-গুলোকে প্রতিশ্রুতির হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে রেখেছে। অতএব অদ্যকার মাংসের এই দৃষ্টিগ্রাহ্য অস্তিত্বটাকে ভুলে গিয়ে নতুন বছরের প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে পারছে না কেউ। ডেক-চিটার এতো কাছে বসে রয়েছে যে, জিভ দিয়ে অভ্যন্তরের মাংস টুকরোগুলোকে স্পর্শ করতে পারে। ওদের কাছে নতুন বছরের দূরত্ব আজ লক্ষ মাইলের চেয়েও বেশি।

সুনন্দার কথায় কান দিল না কেউ। লক্ষ্মণ মাইতির ছোট

ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, সেদ্ধ হতে আর কতক্ষণ লাগবে গো মাঠাকরুণ? পর পর বার দুই হাই তুলল ছেলেটা। হাই তুলল আরো অনেকে। তারপর এক এক করে ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল উনোনের চারপাশে। মাংস খেতে পেল না বটে, কিন্তু আগুনের তাপ লাগছিল গায়ে। অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেগুলো এমনি করে মাটির ওপর পড়ে থাকবে কতক্ষণ? সুনন্দা বলল, 'আমি যাই, লক্ষ্মণ মাইতির বউকে গিয়ে খবর দিয়ে আসি। বছরের শেষদিন আজ। লক্ষ্মণ হয়তো অন্য কোনো বস্তিতে গিয়ে রাত কাটাচ্ছে।' একটা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে সুনন্দা চলে গেল বস্তির ভেতর।

উনোনের সামনে একা বসে রইল সতু। প্রকাণ্ড বড় ডেকচিটার অভ্যন্তরে যে কী হচ্ছে তা সে জানে না। নিজের জীবনের অভ্যন্তরে দৃষ্টি ফেলবার চেষ্টা করছিল। বাবার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কয়েকটা মাস সে আলাদা হয়ে থাকতে চায়। কোথা থেকে যে জীবনটা শুরু করবে বুঝতে পারছে না সতু। তবে একথা ঠিক যে, বাবার আশ্রয় থেকে পালিয়ে যেতে না পারলে কোনো কিছুই গড়তে পারবে না সে।

লক্ষ্মণ মাইতির বউ সুরমা ঘরে ছিল না। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারল না। সুনন্দা নিজেই এবার বাচ্চাগুলোকে কোলে করে যার যার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল।

ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে পরিমল এসে দাওয়ার সামনে দাঁড়াল। বাঁশের খুঁটিটার ওপর মাথা ঠেকিয়ে সুনন্দাকে বলল, 'যা হোক কিছু একটু খেয়ে নিয়ে আমি আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। তুমি গিয়ে সতুর সঙ্গে গল্প করো, আমি নিজেই ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসছি।'

'ঘরের মেঝেতে আমি আসন পেতে রেখেছি, তুমি গিয়ে বসে পড়ো। ভাত বেড়ে আনছি। হাত ধুয়ে এসো।'

হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে চলে গেল পরিমল। খেতে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সতু খাবে না?'

'বলছে তো সেই মাড়োয়ারী বন্ধুর বাড়ীতে দুপুরবেলা এতো খেয়েছে যে খিদে নেই। সত্যি বলছে কিনা কে জানে।' থালায় হুড়হড় করে ডাল ঢেলে দিতে দিতে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'চীনারা কি সত্যি সত্যি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে?'

গোলাকৃতি স্তূপের মতো ভাতটা থালার ওপর উঁচু হয়েছে। হাত দিয়ে চেপে স্তুপটাকে একটা আকার দিচ্ছিল পরিমল। মাথার দিকটা ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে দিয়ে তলার দিকটা সরু করে দিল। মাস্টার মানুষ, ভারতবর্ষের মানচিত্রটা মুখস্থ। জলের মতো ডালের স্রোত দক্ষিণ ভারতের দুটো তীরেই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সুনন্দা ভাবল, ভারতবর্ষের উত্তর দিকে দৃষ্টি নেই পরিমলের। শুধু টিপে টিপে দক্ষিণের আকারটাকে নিখুঁত করছে। ইস্কুলে ভূগোল পড়ায় পরিমল।

'মাংস রান্না হয় নি?' জিজ্ঞাসা করল পরিমল।

'না। এখনো অনেক সময় লাগবে।'

'তা হলে সতুকে খেতে দেবে কি? শুধু ডাল আর আলু ভাতে দিয়ে সতুর বোধ হয় পেট ভরবে না। মাংসটা হোক। তারপর ওকে খেতে দিও।' মৃদু হেসে আলুর পিণ্ডটাকে কাটলেটের মতো চ্যাপ্টা করে দিয়ে পরিমল বলল, 'এটা হচ্ছে গিয়ে সিংহল দ্বীপ—সিলোন। এই ছাখো, মেইনল্যাণ্ডের সঙ্গে ফাঁক রয়েছে। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তোমার ডালের সমুদ্র।'

ভাত দিয়ে তৈরি ভারতবর্ষের মানচিত্রটাকে ভেঙে ফেলে ডাল দিয়ে কচলে নিয়ে গপাগপ্ করে খেতে লাগল সে।

কণ্ঠস্বরে বেদনার ধ্বনি তুলে সুনন্দা বলে উঠল, 'হায় হায়, করলে কি! পুরো দেশটাকে ভেঙে ফেললে?'

'না ভাঙলে গড়া যায় না।' জল খেয়ে উঠে পড়ল পরিমল।

এঁটো বাসনগুলো কলতলায় নিয়ে গেল সুনন্দা। ওখান থেকেই সে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ো না ঠাকুরপো। আমি আসছি।'

রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় ভেতরের সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। খুব দরকার না হলে ঘরের আলো জ্বালায় না কেউ। ভেতরে ঢুকে ঘুমন্ত বান্টুর মুখটা দেখতে লাগল পরিমল। বান্টুর খোঁড়া পা-টা যে জখম হয়েছে আজ তা সে জানে। ওর পায়ের ওপর হাত বুলিয়ে নিল একবার। এই পা নিয়েই সারাটা পথ হেঁটে এসেছে ছেলেটা। দয়া করে কেউ ওকে গাড়িতে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেয়নি। ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণ থেকে একজন মাড়োয়ারীকে বাঁচাবার জন্য আহত হয়েছে বান্টু।

বিছানার পাশে বসে পড়ল পরিমল। সন্ধ্যার সময় শরীরটা ভাল ছিল না। রাস্তার মোড়ের পার্কে গিয়ে ঘণ্টা দুই বসে থাকবার পর খানিকটা সুস্থ বোধ করছিল সে। এখন ভাত খেয়ে আবার যেন অস্বাস্থ বোধ করতে লাগল।

বান্টু ওর নিজের ছেলে নয়। এই কথাটাই শুধু বাবার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিল সে। শুধু বাবা নন, পার্টির কমরেডরাও কেউ জানে না। পশ্চাৎ-স্মৃতির সুতো ধরে টান মারল পরিমল। কী বিচিত্র ওর জন্মের কাহিনী! পূর্ববঙ্গের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে জন্মেছিল বান্টু। পুলিশের গুলি খেয়ে ওর প্রথম স্বামী কমরেড একরামুল্লা মারা গিয়েছিল। সুনন্দা তখন সবে মাত্র গর্ভবতী হয়েছে। মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে কোনো রকমে পালিয়ে এসেছিল সে। পুলিশ ওদের ধরতে পারে নি।

বিছানায় বসে বান্টুর মুখের ওপর দৃষ্টি বুলতে লাগল পরিমল। সুনন্দার মুখের সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। অতএব বান্টু তার বাবার আকৃতিই পেয়েছে। সুনন্দার প্রথম স্বামীকে সে দেখে নি। এমন কি তার ফোটোর সঙ্গেও পরিচয় নেই ওর। পূর্ববঙ্গ থেকে

পালিয়ে আসবার সময় সুনন্দা তার কোনো চিহ্নই সঙ্গে আনে নি। একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে বান্টু।

রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় আধো-অন্ধকারের মধ্যে বসে পরিমল একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই ওর প্রথম অস্বস্তি। পার্টির আদর্শের কাছে পারিবারিক সুখশান্তির সমস্যাকে চিরদিনই সে গৌণ বলে ভেবেছে। সুনন্দাকে বিয়ে করবার পর তার পূর্বস্বামী কিংবা সন্তানের কথা ভেবে কোনোদিনই অস্বস্তি বোধ করে নি। আজকাল মতের বাঁধনটা যেন একটু ঢিলে হয়ে পড়েছে। বান্টুকে দেখলে হঠাৎ সে কখনো কখনো গম্ভীর হয়ে যায়। হয়তো বা মনে ওর ঈর্ষার উদ্রেক হয়। কারণ না থাকলেও পরিমল আজকাল ভাবে, বান্টুর প্রতি সুনন্দা যেন সব ব্যাপারেই পক্ষপাতিত্ব দেখায়। অতীতের স্মৃতির প্রতি সুনন্দা বোধ হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। পীড়িত বোধ করে পরিমল। সুনন্দার প্রতিটি কাজের ওপর নজর রাখে সে। এই সব কারণেই আজকাল অসুস্থ শরীর নিয়েও সে বাইরে বেরিয়ে যায়। কাজ না থাকলেও পার্টির অফিসে বসে খবরের কাগজ কিংবা মার্ক্সীয় দর্শনের মোটা মোটা বই পড়ে। দর্শনের জটিলতার মধ্যেই এখন ডুবে থাকতে পছন্দ করে বেশি। এমন কি ভারতবর্ষের উত্তর দিকটাতেও দৃষ্টি দিতে ইচ্ছা হয় না। বোধহয় সেই কারণেই সুনন্দার প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দিতে পারে নি। চীনাবা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে কিনা সে সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নয় সে।

ঘর জুড়ে তক্তাপোশ। বিয়ের সময় অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছিল পরিমল। একজন কমরেড ছুতোর মজুরী না নিয়ে তক্তাপোশটা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল। অনেক সাধাসাধি করা সত্ত্বেও মজুরী নেয়নি সে। শেষ পর্যন্ত কমরেড ছুতোরটিকে বিলেতী ইস্পাতের একটা বাটালি কিনে দিয়েছিল পরিমল। একজন মার্ক্সবাদীর পক্ষে বিনামূল্যে অপরের শ্রমদানের ফল গ্রহণ

করা সম্ভব হয় নি। মজুরীর চেয়ে বাটালির দাম পড়েছিল বেশি। বিলেতী ইস্পাতের বাটালি খোলা বাজারে পাওয়া যায় নি বলে অনেক বেশি দাম দিয়ে কালো বাজার থেকে কিনতে হয়েছিল।

ঘর জুড়ে তক্তাপোশ। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিছানাটা আজ দেখতে লাগল পরিমল। গোটা তিন সন্তান হলেও এখানে স্থানের অভাব হতো না। অন্ততঃ একটি সন্তানের পিতা হতে পারবে মনে করে বড় করে তক্তাপোশ তৈরি করেছিল। গুজরাটিদের দোকান থেকে নিজে গিয়ে হিসেব করে কাঠও কিনেছিল সে। হিসেবের মধ্যে ছোট্ট একটা স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল। ভেবেছিল, রক্ত-মাংসের স্বপ্নটা বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়বে।

এখন এখানে কমরেড একরামুল্লার ছেলে বান্টু শোয়। ডান পা'টা ধনুকের মতো বাঁকা বলে টান হয়ে শুতে পারে না। সেইজন্য বান্টুর জায়গা লাগে বেশি। বেচারী বান্টু। বান্টু নয়তো বুলেট! বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দিলেও মাঠ-ময়দানেও আরাম করে ঘুমিয়ে থাকতে পারে। কবে যে ফেটে পড়বে একমাত্র ইতিহাসই জানে। বান্টুর মধ্যেই বোধহয় ভবিষ্যতের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। বান্টুই হচ্ছে ভারতবর্ষের উত্তর মীমাংসা।

ছেলেটার পাশে শুয়ে পড়ল পরিমল। অতীত স্মৃতির লাটাই থেকে সুতো টানতে টানতে হঠাৎ একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাসনগুলো মেজে এবং ধুয়ে-মুছে রেখে আসতে পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগল না সুনন্দার। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাজটা শেষ করে ফেলতে পারত। কিন্তু ইচ্ছে করেই দেরী করল সে। পরিমলের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। ভারতবর্ষের সোসিও-ইকনমিক অবস্থার প্রতি পরিমলের যেন তেমন আর নজর নেই। যতক্ষণ বাড়ি থাকে ততক্ষণ সে বান্টুর ওপর নজর ফেলে রাখে। তন্ময় হয়ে কি যেন দেখে। দু-একদিন ধরা পড়বার পর

তন্ময়তা ভেঙ্গে গিয়েছে বটে, কিন্তু খোলাখুলি কোন কথা হয় নি। প্রশ্নও করে নি সুনন্দা।

কলতলা থেকে উঠে পড়তে অনাবশ্যক সময় নষ্ট করছিল সে। রাত প্রায় দশটা। সুশীলার ঘরে লোক ঢুকেছে বলে তার ছেলেটাকে দাওয়ার ওপর শুইয়ে রেখেছিল সুনন্দা। ছেলেটার গায়ে ঠাণ্ডা লাগছে। বান্টুর পাশে শুইয়ে দেবে কিনা ভাবতে গিয়ে সে দেখল, ও-পাশের রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে ঝন্টু দাস বস্তির পেছন দিকে চলে গেল। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে সে। মোটর মেরামতের মিস্ত্রী। দক্ষিণ কলকাতার মোটর গাড়ির মালিকরা সবাই ঝন্টুকে চেনেন। মোটর মেরামতের জগতে ঝন্টুর খুব নামডাক আছে। ভোরবেলা কোনও কোনও দিন দু-চারজন লক্ষপতি এসে ঝন্টুর দরজায় ধরণা দেন। ভোরবেলা এসে ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। মাতাল অবস্থায় ঝন্টু একবার গাড়ি চালাতে গিয়ে ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। বাঁ হাতটা কেটে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু এক হাত দিয়ে ঝন্টু যা কাজ করে তেমন কাজ দু-হাতওয়ালা মিস্ত্রীরাও করতে পারে না। দৈনিক ওর বিশ-পঁচিশ টাকা রোজগার। কিন্তু রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন ওর পকেটে পাঁচটা টাকাও থাকে না। তাই নিয়ে প্রতিদিনই মনোরমার সঙ্গে ঝগড়া হয়। বছর পাঁচ আগে বিয়ে হয়েছে ওদের। কোনও কোনও দিন সকালবেলা বাজার করবার পয়সা দিতে পারে না ঝন্টু। মনোরমা তখন গর্জন করে বলে, 'ওরে হাত-কাটা মিস্ত্রী, এবার তা হলে আমি নিজেই যাব রোজগার করতে। তোকে সাবধান করে দিলাম।' কথা রেখেছিল মনোরমা।

বস্তির পূবদিকটাতে হাফ-গেরস্তদের বসতি। মনোরমার বয়স কম, স্বাস্থ্যও ভাল। রোজগার করবার জন্য ওর বাইরে যাওয়ারও দরকার নেই। রোজগারের কথা তুললেই ভয় পায় ঝন্টু। সেদিন

সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। ঘরে বসে মদ খায়। আজও বোধ হয় সেই রকমের ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছিল। বছরের শেষ দিন আজ। তা সত্ত্বেও ঝণ্টু তাড়াতাড়ি ফিরে এল বস্তিতে।

সতুর পাশে বসে পড়ল সুনন্দা। উনোনের আগুন এবার নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। শেষ কাঠখানা উনোনের মধ্যে ভরে দিয়ে বলল, 'খেয়েদেয়ে দাদা তোমার শুয়ে পড়েছেন। ঠাকুরপো, ঘুম আসছে না তোমাব ?'

'না।'

'রতিলালের বউ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে বুঝি ?'

'তুমি কি করে জানলে বউদি।' অবাক হল সত্যপ্রকাশ।

'আমি টেলিফোন করেছিলাম দু-তিন জায়গায়। শুধু সুশীলাই তোমাব খবব দিতে পাবল।' একটু থেমে সুনন্দাই বলল, 'তুমি বেরিয়ে আসবার পবেই বোধহয় কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। গলার আওয়াজটা ভেজা-ভেজা ঠেকছিল।'

'রতিলাল আজ ভারতবর্ষের বাইরে চলে গেল। একটু কাঁদাকাটি করবেই।'

সুনন্দা কোন মন্তব্য করল না। মৃদু হেসে সিগারেট ধরাল সে।

বছরটা শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছে না। রাত এগারটা বাজল। পাশের রাস্তা দিয়ে পূবদিকে লোকজন যাওয়া আসা করছে। শুধু ওদিকেই কেন লোকজন যাওয়া-আসা করছে তার কারণটা অবশ্য সতুব জানা নেই। জানবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশও করল না। কোট-প্যাণ্ট পরা কে একজন ভদ্রলোক ওদিক থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপর বসে বমি করতে লাগল। শব্দ পেয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল সতু। সুনন্দা তাকে হাত দিয়ে ধরে রেখে বলল, 'এদের কোন সাহায্যের দরকার নেই। রোজই ওরা বমি করে, কষ্ট পায়। তবু অন্ধকারে গা ঢেকে রোজই ওরা আসে এখানে। পরোপকারের জন্য তোমার এত ছটফট করবার দরকার নেই ঠাকুরপো।'

বসে পড়ল সতু।

একটু পরেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বউদি, তুমি তো সারাজীবন রাজনীতি করেছ। ঘর-সংসার নিয়ে মেতে থাকতে ভাল লাগে তোমার?'

মিষ্টি হেসে সুনন্দা বলল, 'আমার ঘরেও তো রাজনীতি রয়েছে সতু।'

'আচ্ছা বউদি, দাদার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কি করে?' প্রশ্ন করে সুনন্দার দিকে চেয়ে রইল সতু।

গল্প শোনবার শখ হয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ বউদি। অতীতের গল্পটা শোনাবে বলে বার কয়েক কথা দিয়েছিলে তুমি। তোমার যদি ঘুম না পেয়ে থাকে তো বল।'

'শুধু একটা রাত জাগলেই তো গল্পটা শেষ হবে না। আরও অনেক রাত জাগতে হবে।'

'বেশ তো, জাগব। শুধু তোমার কষ্ট না হলেই হয়।'

'আমার বোধ হয় আর কষ্টবোধ নেই রে সতু। মন আর দেহ দুটোই পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছে।'

'বারে রে, তা কি করে হয়? বাপু, হল কি করে?

পাথরের গায়েও গাছ-গাছড়া গজায়।' মৃদু হেসে গল্প বলতে আরম্ভ করল সুনন্দা।

'পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে আমরা বাস করতুম। আমার বাবা পঙ্কজ দাশগুপ্ত উকিল ছিলেন। জেলা আদালতে বেশ নাম ছিল তাঁর। ধর্মভীরু মানুষ, কিন্তু ফৌজদারী আইনের মারপ্যাঁচ খুব ভাল বুঝতেন। তাঁরই শাসনাধীনে মানুষ হচ্ছিলাম আমরা। তাঁর সাধারণ কথাবার্তাও বেদবাক্য বলে গ্রহণ করেছি। উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতেন তিনি—' মৃদু হেসে সুনন্দা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল, 'একবার একটা ভারী

মজার ব্যাপার ঘটল। পূর্ববঙ্গের একজন স্বনামধন্য জমিদার কাশীচরণ নাগ একটা খুনের মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাবাকে উকিল রেখেছিলেন তিনি। পুরো মোকদ্দমার জন্য বিশ হাজার টাকার কনট্রাক্ট হল বাবার সঙ্গে। পাঁচ হাজার টাকা আগাম নিলেন। মোকদ্দমার দিন সকালবেলা ঠাকুরমার কাছ থেকে একটা চিঠি এল। তিনি থাকতেন বিক্রমপুরের একটা গ্রামে। গ্রামের নাম ছিল মুন্সিগঞ্জ। সেখানেই আমাদের পৈতৃক বাড়ি। ঠাকুরমার চিঠি পাওয়ার পর বাবা বললেন, আমাকে এক্ষুণি দেশের বাড়ির দিকে রওনা হতে হয়। মা ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলুম। বড়দা বলল, আজ তো কাশীচরণ নাগের মোকদ্দমা শুরু হবে বাবা। বড়দার কথায় কান দিলেন না। একটা স্যুটকেশ গুছতে গুছতে বললেন, মা আদেশ করেছেন। যেতেই হবে। মোকদ্দমাটা ছেড়ে দিয়ে যাব। যাওয়ার পথে পাঁচ হাজার টাকাটা ফিরিয়ে দেব নাগ মশাইকে। বাবার কাণ্ড দেখছিলেন মা। একটু বিরক্তির স্বরে মা বললেন, বিকেলে গেলেই তো হয়। মোকদ্দমাটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমরা জানতাম, বিদ্যাসাগর মশাইকে অনুসরণ করছিলেন বাবা। মায়ের কথায় ঈশ্বরচন্দ্র সমুদ্রপাড়ি দেন নি। বাবা এখন মায়ের আদেশ পালন করার জন্য পদ্মা পাড়ি দিলেন। সত্যি সত্যি মোকদ্দমাটা ছেড়ে দিলেন তিনি। ঢাকা শহরে হৈচৈ পড়ে গেল। বাবার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী উকিল হাত বাড়িয়ে বসেই ছিলেন। সুযোগ পেয়ে মকদ্দমাটা লুফে নিলেন তিনি। মুন্সিগঞ্জ গ্রামে পৌঁছতে তাঁর বেলা তিনটে বেজে গেল। ঠাকুরমা ঘুমচ্ছিলেন। তাঁর ঘুম ভাঙালেন না। বাইরের ঘরে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে রইলেন বাবা। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম ভাঙল তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ঠাকুরমাও তাঁর ঘুম ভাঙালেন না। অপেক্ষা করে রইলেন। মনে মনে বললেন,

আহা, রাতদিন মোকদ্দমার নথিপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ঘুমবার সুযোগ পায় না। এখন নিরিবিলিতে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিক পঙ্কজ। বাবার সঙ্গে কথা বলবার তেমন কিছু তাড়া ছিল না ঠাকুরমার। রাত্রিতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ডেকে আনলে কেন?

'আমাদের সেই ভাগ-চাষী বসিরুদ্দীনের বড় বিপদ রে পঙ্কজ।'

'কেন, কি হল তার?' ভাত খেতে বসেছিলেন বাবা। ঠাকুরমার কথা শুনে গলায় তাঁর ভাত আটকে যেতে লাগল। মাতৃ-আজ্ঞা পালন করবার জন্য বিশ হাজার টাকার একটা মোকদ্দমা ছেড়ে দিয়ে পত্রপাঠ চলে এসেছেন তিনি। ভেবেছিলেন, ঠাকুরমার হয়তো অসুখ-বিসুখ করে থাকবে। কিন্তু ভাগ-চাষী বসিরুদ্দীনের বিপদের কথা কল্পনাও করতে পারেন নি। ঠাকুরমা চুপ করে আছেন দেখে বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বসিরুদ্দীনের কি বিপদ হয়েছে?'

'তিন বছর ঘর করবার পর ওর বউ মেহের বিবি তিন দিন হল নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। তুই তো বড় উকিল পঙ্কজ, বউটাকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করে দে। রোজই আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করে বসির।' দুদিন পর গ্রাম থেকে ফিরে এলেন বাবা। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বললেন না। গম্ভীরভাবে অফিস-ঘরে বসে পুরনো নথিপত্রের পাতা ওলটাতে লাগলেন। ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন মা। মাঝে মাঝেই মুখ টিপে হাসছিলেন। বিকেলবেলা ইস্কুল থেকে ফিরে আসবার পর মা আমাদের বললেন, 'বিদ্যাসাগরের জীবনীখানা সরিয়ে ফেলেছেন উনি।'

'সরিয়ে ফেললে কি হবে, পুরো বইটা তাঁর মুখস্থ।' মন্তব্য করল আমার বড়দা সুজিত। প্রায় দুটো দিন বাবা আর আমাদের সঙ্গে মন খুলে কথা বললেন না। নীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া তো দূরের কথা, বড়দা সেদিন রাত করে বাড়ি ফিরল বলে তাকে শাসন পর্যন্ত করলেন না। আমরা ভাবলুম, শুধু বিদ্যাসাগর

নয়, বোধ হয় পুরো উনবিংশ শতাব্দীটার ওপরেই তাঁর অনাস্থা এসে গিয়েছে। সতু কি ঘুমিয়ে পড়লি না কি?'

'না বউদি। মনপ্রাণ দিয়ে পুরনো শতাব্দীটাকে বোঝবার চেষ্টা করছি। শিক্ষিত আর বুদ্ধিমান লোকদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই যে, উনবিংশ শতাব্দীটা নাকি ভারত-ইতিহাসের একটা গৌরবময় পরিচ্ছেদ। তোমার গল্পের আলোয় আশপাশটা একটু ভাল করে দেখতে চাই বউদি। তোমরা ক ভাই ক বোন?'

'দু ভাই, তিন বোন। আমিই সবার চেয়ে ছোট। বাবার ধারণা ছিল তাঁর পাঁচটি সন্তানই এক-একটি রত্ন। আমিই একটু-আধটু গান শিখেছিলুম। বাবা গর্ব করে বন্ধুদের কাছে বলতেন যে, আমার মত ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত অন্য কেউ আর গাইতে পারে না। সত্যি-সত্যি এটাই তাঁর বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেকটি সন্তান সম্বন্ধে এই রকমই ধারণা ছিল বাবার। তারপর যখন তাঁর বিশ্বাসের জগৎটা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল, তখন তিনি কী সাংঘাতিক কষ্টই না পেতে লাগলেন। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় আমার নাম দিয়েছিলেন তিনি। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সেখানে। তারপর যখন দশটি পুরস্কারের মধ্যে একটি পুরস্কারও আমি পেলুম না, তখন তিনি ওখানে বসেই চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমাদের প্রত্যেকটি ভাই-বোনকে কেন্দ্র করে বাবা এক-একটা অবাস্তব জগতের গোড়াপত্তন করেছিলেন। শুধু অবান্তর নয়, অসম্ভবও—'

'হ্যাঁ, অনেকটা উনবিংশ শতাব্দীর মতই -·'

সতুর মন্তব্য শুনে গল্প বন্ধ করে উনোনের নিবন্ত আগুনটা খুঁচিয়ে দিল সুনন্দা।

রাত বাড়ছে। এর পর হাফ-গেরস্থদের ঘরগুলোতে লোক-জনের ভিড় বাড়বে। হৈ-হল্লা শুরু হয়ে যাবে। সুনন্দা বলল, 'তুমি একটু ব'সো ঠাকুরপো। সুশীলার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে আসি।'

ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে সুনন্দা চলে গেল অন্ধকার বস্তিটার দিকে।

উনোনের সামনেই বসে রইল সতু। বউদির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওপাশের রাস্তা দিয়ে লোকজন যাওয়া-আসা করছে। একটা লোক চলতে চলতে হঠাৎ ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। উনোনের আগুন দেখে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কে বাবা তুমি? এই অন্ধকারের রামরাজ্যে আগুন জ্বালিয়ে বসেছ?'

'কি চাই আপনার?' জিজ্ঞাসা করল সত্যপ্রকাশ।

'কিছু চাই না, আমরা স-ব পেয়েছি। ভারত সাম্রাজ্যের মসনদ আমাদের মুঠোর মধ্যে।' লোকটা মাতাল। প্রথমে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর মুখ চেপে হাসতে গিয়ে বমি করে ফেলল। সতু এবার লোকটার কাছে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল গান্ধীটুপি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছে সে।

লোকটা যে মাথায় গান্ধীটুপি পরে এসেছিল তা সে দেখতে পায় নি। গাধার দুধের মত সাদা ধবধবে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে। চেহারাটা কি চেনা? বাংলা দৈনিক কাগজে ছবি ছাপা হয় বলে সন্দেহ হল সতুর। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে একটা রুমাল দেব?'

'কেন?'

গান্ধীটুপিটায় নোংরা লাগছে।'

সতুর কথা শুনে লোকটা হো হো, হা হা করে হেসে নিল খানিকটা। বিশ্ব-সংসারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত ভঙ্গী করে বলল সে, 'যাঃ! গান্ধীটুপিতে কখনও ময়লা লাগে না। এ বড় সাংঘাতিক জিনিস ভাই। যাক যাক, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি—' সতুর দিকে এগিয়ে এসে লোকটি জিজ্ঞাসা করল। 'হাফ-গেরস্থদের পাড়াটা কোন্ দিকে? সুশীলা বলে একটা মেয়ে থাকে সেখানে।'

'কি রকম দেখতে?' ফস করে প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সতুর।

গান্ধীটুপিটা পকেটের মধ্যে ভরে রেখে লোকটি জবাব দিল, 'চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশী শুনেছি।' জবাব শোনবার জন্য অপেক্ষা করল না। টলতে টলতে পূর্বদিকে পথ ধরল সে। আধো-অন্ধকার বস্তিটার ওই অংশটাতে বিন্দুমাত্র আলো নাই। কথাটা ভাবতে ভাবতে আবার এসে উনোনের সামনে বসে পড়ল সত্যপ্রকাশ।

সুশীলার ঘরে আবার নতুন লোক ঢুকেছে। ছেলেটাকে অন্য একজনের ঘরে রেখে এসে সুনন্দা বস্তির পূর্বদিকে হাঁটতে লাগল। দিনের বেলা ঐ দিকে সে বহুবার গিয়েছে, কিন্তু বেশি রাত্রে সীমানা কখনো অতিক্রম করে নি। আজ সে রাস্তাটা পার হয়ে এল। ঘরগুলোতে কি হচ্ছে দেখবার কৌতূহল হল ওর।

গোটা কয়েক চালাঘর। প্রত্যেকটা ঘরই আলোকিত। হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো দিয়ে ঘরগুলোকে আলোকিত করে এরা। সরু রাস্তাটার মধ্যে ঢুকে পড়ে সুনন্দার আগ্রহ বাড়ল খুব—দেখবার আগ্রহ। সতুর কথা মনে রইল না আর। শীতের রাত্রেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল কণ্ঠাস্থির তলায়। মাঝখানের ঘরটাতে মঞ্জু বলে একটি মেয়ে থাকে। মাসখানেক আগে এখানে এসে ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ভদ্রলোকের মেয়ে, বছর বাইশ বয়স হবে। ঝণ্টু মিস্ত্রীর কাছে শুনেছে, স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়েটা নাকি ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।

বেড়ার ফুটোতে চোখ রাখল সুনন্দা। বড় ফুটো। আরও একটু বড় হলে মন্দ হত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকটিকে চিনতে পারল সে। একজন সরকারী অফিসার। এই লোকটিই একবার রাজবন্দীদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে এখন একটা সেপাই পাহারা দিচ্ছে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে কণ্ঠাস্থির তলাটা ভাল করে মুছে ফেলল

সুনন্দা। এতদিন পরেও অফিসারটি নিজের স্বাস্থ্য বেশ ভাল রেখেছে। মঞ্জুর স্বাস্থ্যও হিংসে করবার মত। আহা, এমন স্ত্রীর ওপর স্বামীটা কেন অত্যাচার করত! বোকা, বুদ্ধু পুরুষ। নয়তো পুরোপুরি কর্মক্ষম নয়। সেইজন্যই পালিয়ে এসেছে মেয়েটা।

মাত্র কুড়িটা টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানার ওপর। মাইনে আর ঘুষ মিলিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে লোকটা। মঞ্জুর মত মেয়ের অনেক বেশী মজুরী পাওয়া উচিত ছিল। পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ-নীতি হাফ-গেরস্থদেরও মুক্তি দেয় নি। এখানেও দু-আন দাম দিয়ে ষোল আনার জিনিস কিনছে। নিজের বুকের ওপর হাতা রাখল সুনন্দা।

শুধু দু-এক টুকরো গরুর মাংস খেয়ে পূর্ব-স্বাস্থ্য আর বোধহয় ফিরে আসবে না। এক সময়ে ষোল থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধারাও চেয়ে চেয়ে স্বাস্থ্য দেখত ওর। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অন্ধকারে হীরের টুকরোর মত জ্বলজ্বল করত সুনন্দা। আর এখন!

ওখান থেকে সরে আসতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। সরকারী কর্মচারীটি মঞ্জুকে বলছিল, 'দিন পনরো রোজই আমি আসব। অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। কত দিতে হবে?'

'কুড়ি টাকা করে যত হয়।' জবাব দিল মঞ্জু।

'সে তো খুচরো রেট। আমি দেব পাইকারী রেট। একসঙ্গে আড়াই শো দেবো।'

বটে! সুনন্দা মুহূর্তের মধ্যে রেগে আগুন হয়ে গেল। দেশের সোসিও-ইকনমিক দুরবস্থার সুযোগ নিচ্ছে লোকটা। মাঝরাত্রে হল্লা-চিৎকার করে প্রতিবাদ করলে কাজ কিছু হবে না। কাল সকালে মঞ্জুকে ডেকে সমঝে দেবে সে। বলবে, ডবল করে মজুরী নাও তুমি।

আরও গোটা কয়েক ঘরের সামনে এবং পেছনে গিয়ে উঁকি

দিয়ে এল সুনন্দা। সেপাইটা মনিবের পেছনে পেছনে বস্তির বাইরে চলে গিয়েছিল। এখন দেখল, সেই সেপাইটাই ফিরে এসে ঢুকে পড়ল মঞ্জুর ঘরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। হাফ-গেরস্থদের পাড়া থেকে বেরিয়ে এসে পণ্ডিতিয়া রোডটা পার হয়ে এল। উল্টো দিকে শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। মস্ত বড় একটা ম্যানশন তুলেছেন। ভাড়া খাটান তিনি। পার্টির আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আছে তাঁর। পার্টির তহবিলে প্রচুর টাকা চাঁদা দেন। সুনন্দা বহুবার তাঁর কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে এনেছে। এখন দেখল, মত্ত অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমে এলেন শশাঙ্কবাবু। সুনন্দাকে দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত্রে এখানে? চাঁদার দরকার আছে বুঝি?'

'না। আমি আপনার টেলিফোনটা একবার চাই।'

'একবার? একশোবার নিন। কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টকে উৎখাত করবার জন্য হাজার বার টেলিফোন করুন। ওরা আমার বহু টাকা খেয়েছে—শেষ পর্যন্ত একটা ডেপুটি মিনিস্টার পর্যন্ত করতে চাইল না। আপনাদের রাজত্বে আমি কি হব? বিপ্লব শুরু হতে আর কতদিন বাকি? মিসেস সিংহ—' শশাঙ্কবাবুর গলা ভিজে এল।

সুনন্দা বলল, 'আপনার দারওয়ানকে বলুন না, টেলিফোনটা একবার নীচের ঘরে নামিয়ে আনতে।'

'হাজার বার আনবে—এই ছোটেলাল, তুম্ কাঁহা গিয়া? দেখুন ব্যাপার, আমার একশো টাকা মাইনের নাইট গার্ড কী সুন্দর ডিউটি দিচ্ছে। দাওয়ার ওপর শুয়ে কী চমৎকার আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। মিসেস সিংহ, এই সুযোগ—আমি বলছি এই সুযোগ—'

'কিসের সুযোগ?'

'লাথি মারবার—'দাওয়ার সামনে এগিয়ে গিয়ে ছোটেলালের

গায়ে লাথি মারলেন শশাঙ্কবাবু। হুড়মুড় করে উঠে বসে ছোটেলাল জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়া হুয়া ?' হঠাৎ শশাঙ্কবাবুকে চিনতে পেরে ছোটেলাল বলল, 'কসুর হয়েছে আমার।'

'এ-ব্যাটা তবু কসুর স্বীকার করল। ওরা তাও করে না। আমার বহু টাকা খেয়েছে—এই ছোটেলাল, শিগগির যা, ওপর থেকে টেলিফোনটা খুলে নিয়ে আয়। মিসেস সিংহ, বিপ্লবের জন্য যতক্ষণ ইচ্ছে বসে বসে টেলিফোন করুন। বিলের টাকা দেব আমি। ওপর থেকে চা পাঠিয়ে দেব কি ?'

'দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

ফটকের বাঁ পাশে ছোট্ট একটা ঘর। ভাড়াটেদের সুবিধার জন্য সকালবেলা এখানে একটা টেলিফোন রেখে দেওয়া হয়। সুনন্দা গিয়ে সেই ঘরটাতে ঢুকে পড়ল। ছোটেলাল রিসিভার নিয়ে আসবার পর পূর্ণদাস রোডে টেলিফোন করল সে।

'হ্যালো —'

'গোপীবাবু বাড়ী আছেন ?'

'না। আপনি কে ?'

জবাব না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুনন্দা।

ঘরে আজ একটিও টাকা নেই। সুনন্দা ভাবছিল। শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকে গোটা কয়েক টাকা ধার চেয়ে নেবে। টাকার অভাবে পরিমলের ওষুধটা কিনতে পারে নি। প্রতিদিন প্রায় তিন টাকার ওষুধ খেতে হয়।

মাথা নিচু করে উনোনের সামনে বসে ছিল সত্যপ্রকাশ। হঠাৎ একটা লোক এসে সামনে দাঁড়াল ওর। লোকটাকে চেনে সতু। গীতা বউদির ড্রাইভার বাবুলাল।

'কি ব্যাপার বাবুলাল ? এত রাত্রে ?'

'মেমসাহেব আপনাকে একবার সেলাম দিয়েছেন।'

'কোথায় তিনি ?'

'গাড়িতে বসে আছেন। আসুন।'

বাবুলালের পেছনে পেছনে সত্যব্রত বেরিয়ে এল পণ্ডিতিয়া রোডে।

প্রকাণ্ড বড় আমেরিকান গাড়ি। পিছনের সিটে দেহ এলিয়ে বসেছিলেন গীতা বউদি। খাড়া হয়ে বসবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। গা থেকে সেন্ট আর মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। দুটোই বিলিতী। ঝুঁকে বসে দরজা খুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'উঠে এস ঠাকুরপো। ওখানে বসে কি করছিলে ? আগুন পোয়াচ্ছিলে নাকি ? মাত্র চব্বিশ বছর বয়স। আহা কী সুন্দর সময় এটা ! এই বয়সে কেউ আগুন পোয়ায় নাকি।'

'আগুন পোয়াচ্ছিলাম না।'

'তবে উনোন জ্বলছিল কেন ?'

'বড় বউদি মাংস রান্না করছিলেন।'

'কিসের মাংস ?' খিল খিল করে হেসে উঠে সতুর হাত ধরে টান মারলেন গীতা বউদি। কাত হয়ে সীটের ওপর ছিটকে পড়ল সতু। বুকের ওর চেপে ধরে তিনি বললেন, 'কাঁচা মাংস খাওয়ার বয়স তোমার। বড় বউদির তো কিছু নেই, তাই তিনি রাত জেগে মাংস সেদ্ধ করছেন—' সতুকে আরো জোরে চেপে ধরে তিনিই বললেন। 'চলো—'

'কোথায় ?'

'তোমাকে নিয়ে পালাব।'

'আমায় ছেড়ে দাও—' গম্ভীর স্বরে বলে উঠল সতু।

'তোমাকে নিয়ে আজ আমি এক্ষুনি ডায়মণ্ডহারবার রওনা হবো। একটা ডাক-বাংলো ভাড়া করে রেখেছি।'

'ভালই তো—আমি যাব না। ওকি করছ ? ছাড়ো বলছি—'

'ঠাকুরপো, তোমাকে যে আমি ভালবাসি।'

'আমাকে জিজ্ঞেস না করে ভালবাসলে কেন? পরামর্শ করা উচিত ছিল তোমার।'

'এসব জিনিস তো ভাই পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করে না। নিজে থেকে জন্মায়।'

'আবার নিজে থেকে মরেও যায়।' নিজেকে মুক্ত করে নিল সত্যপ্রকাশ। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে।

গীতা মিত্র বললেন, 'একটু দাঁড়াও, সতু।'

'কেন?'

'দুপুরবেলা টেলিফোনে কি বলেছিলে?'

'কি বলেছিলাম মনে নেই।'

'টাকার কথা বলেছিলে না? দু হাজার টাকা চেয়েছিলে। এই নাও পাঁচ হাজার টাকার চেক। বেয়ারার চেক। ভাঙিয়ে নিও।'

'মাতালের হাত থেকে আমি একটা পয়সাও নেব না। সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে যখন দেবে তখন নেব। তাও ধার বলে নেব।' চলে আসছিল সতু। তারপর দাদার ওষুধের কথাটা মনে পড়ল ওর। টাকার অভাবে দাদার যে চিকিৎসা হচ্ছে না। তা সে জানত। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল বাবুলাল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে বলল 'বউদি, চেকটা দিয়ে যাও।'

'নেবে? এখনো গরম রয়েছে—' ব্লাউজের ভেতর থেকে চেকটা বার করে এনে সতুর হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তিনিই বললেন, 'তুমি যে নিলে তাতেই আমি খুশি।'

গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেল ওখান থেকে। সত্যপ্রকাশ উনোনের সামনে এসে চেকটা দেখল! সত্যিই পাঁচ হাজার টাকা। কোথাও কোনো ভুল নেই। বিলিতী ব্যাঙ্কের চেক। মুহূর্তের জন্য কি যেন চিন্তা করল। তারপর ডেকচিটার তলা দিয়ে চেকখানা ঢুকিয়ে দিল উনোনের মধ্যে।

পেছনে দাঁড়িয়ে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি রে?'

'পাঁচ হাজার টাকার চেক।'

'পুড়িয়ে দিলি কেন?'

'গীতা বউদি দিয়েছিলেন। কোনো সম্পর্ক আমি তাঁর সঙ্গে রাখতে চাই না।'

সতুকে জড়িয়ে ধরে সুনন্দা বলল, 'তুমি শ্রদ্ধার পাত্র, ঠাকুরপো।'

ঠিক সেই সময় পরিমল বলে উঠল, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে, সুনন্দা!'

হঠাৎ ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেলল সতু।

সুনন্দা বলল, 'একটা ওষুধ কেনবার দরকার ছিল —।'

'কেনা হয় নি কেন, বউদি?'

'দামী ওষুধ – রোজই খেতে হয়। না খেলেও ঘরে রাখতে হয়। হয়তো মাঝরাত্রেও দরকার হতে পারে। ঠাকুরপো, আমাদের হাতে একটা পয়সাও আর নেই।'

নিজের পকেটে হাত ঢোকাল সতু।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

সাতষট্টির প্যাঁচে পড়ে গিয়েছেন গোপীমোহন। বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে যুক্তফ্রন্ট। তাতে যে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়েছে তা নয়। তাঁর মতো একটি চতুর লোকের ক্ষতি করা সহজ কাজ নয়। একটি সম্পূর্ণ বিপ্লবের আগুন না জ্বললে গোপীমোহনরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। গোপীমোহন বলতে শুধু একটি মানুষকে বোঝায় না। গোপীমোহন হচ্ছেন একটি প্রাচীন ঐতিহ্য, একটি চিন্তা, একটি ধারাবাহিকতা—একটি প্রতিষ্ঠান। গোপীমোহন লেখাপড়া করেছেন। তিনি জানেন, প্রতিষ্ঠানের শেকড়টা পুরোনো, জরাজীর্ণ। ভোঁতা খুরপী দিয়েও শেকড়টাকে উপড়ে ফেলা যায়।

সেই জন্যই আজকাল তিনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। অস্বস্তি বেড়েছে তাঁর। বাড়িতেই বসে থাকেন। মাঝে মাঝে কখনো বা লেকের দিকে বেড়াতে যান। অবৈধ সম্পর্কগুলোর কথাও ভুলে গিয়েছেন। দালালরা বাড়ি এলেও দেখা করেন না।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন গোপীমোহন। হঠাৎ কি মনে করে দেবদাস মিত্রকে টেলিফোন করলেন তিনি। বেলা প্রায় এগারোটা। টেলিফোন ধরলেন গীতা মিত্র।

'হ্যালো, কে?' জিজ্ঞাসা করলেন গোপীবাবু।

'আমি গীতা।'

'দেবদাস কোথায়?'

'ঘুমচ্ছে।'

'না, না—টেলিফোনের রিসিভারটা ডান কান থেকে বাঁ কানের কাছে সরিয়ে এনে গোপীবাবুই বললেন, 'না, না, বেলা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। এতকাল গভর্ণমেন্টের লোক থেকে শুরু করে খদ্দর পরিহিত নেতৃবৃন্দ দিনদুপুরেও নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। এখন যুক্তফ্রন্ট কি করে দেখা যাক। কিন্তু বউমা, ব্যবসায়ীদের জেগে থাকতে হবে। ভোর ছ'টার সময় শয্যা ত্যাগ করতে হবে। দেবদাসকে একটু ডেকে দাও—'

কথা বলতে বলতে দেবদাস এসে উপস্থিত হল। গীতা মিত্রের হাত থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়ে পর পর দু-বার হাই তুলল সে। পূর্ণদাস রোড থেকে আওয়াজটা শুনতে পেলেন গোপীমোহন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যালো, ব্যাপার কি দেবদাস? বেলা এগারোটার সময় হাই তুলছ?'

'অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্কটজনক দাদা।'

'সবে তো গদিতে বসল যুক্তফ্রন্ট—এর মধ্যেই সঙ্কটজনক?'

'না, না, যুক্তফ্রন্টের আগে থেকেই অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। প্রফুল্লবাবুর আমল শেষ হওয়ার আগে দশ লাখ টাকার একটা

ইমপোর্ট লাইসেন্স পেয়েছিলাম—সকলকে দিয়ে থুয়ে লাখ খানেক টাকা মার্জিন করেছিলাম—হ্যালো, সত্যি সত্যি মাল আমি আমদানি করিনি—লাইসেন্সটা ঝেড়ে দিয়েছিলাম বড়বাজারে। ঝামেলায় যাইনি দাদা—' দ্বিতীয়বার হাই তুলে দেবদাসই বলল, 'ঘুমটা ভেঙে গেল। একটা মশা গতকাল রাত্রে মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল—হ্যালো গোপীদা, মশাটা ঘুমতে দিল না।'

'কেন, সারারাত কি সে চুপ করে বসেছিল?'

'না। সারারাত বসে রক্ত যা খেয়েছে বেলা দশটার মধ্যে তা হজম করে ফেলেছে। বড় সাংঘাতিক মশা, দাদা! এখন দেখছি দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার খেয়েছে। মাড়োয়ারী কোম্পানীর মতো ফুলে ফেঁপে একটা ফুটবলের মতো আকার ধারণ করেছে। নড়তে চড়তে পারছে না। মশারীর গায়ে লেগে রয়েছে। আমার রক্ত পান করেই—' তৃতীয়বার হাই তুলে দেবদাস বলল, 'একেবারে শেষ মুহূর্তে বিল্ডিং ফাণ্ডের নাম করে পঁচিশ হাজার বার করে নিয়ে গেল।'

'কোন্ বিল্ডিং?'

'চৌরঙ্গীর দিকে কোথায় যেন একটা "ভবন" তৈরি হচ্ছে বলে টাকাটা ওঁরা নিয়ে গেলেন। সবশুদ্ধ নাকি ত্রিশ লাখ উঠেছে বোধ হয় সোনা দিয়ে ইট তৈরি হচ্ছে।'

'এসব কার ভোগে যে লাগছে কে জানে! আর একটি পয়সাও দিয়ো না।'

'থাকলে তো দেব—'

'তার ওপর আবার যুক্তফ্রন্ট এল। মা কালীর কি ইচ্ছে কে জানে। হ্যালো, দেবদাস—এখন একটু সাবধানে থাকতে হবে—মশার উৎপাত আরো বাড়বে। বউমাকেও একটু সামলে সুমলে চলতে হবে।—আমি তো আজকাল বাড়ি থেকে বেরুই না।'

'বত্রিশ সালের ফোর্ড গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরুনো এখন উচিত'

নয়। কি করবেন? হ্যালো গোপীদা, আমার ব্যবসায়ে কিছু টাকা খাটাবেন নাকি?'

'কি খাটাব?'

'টাকা।'

রিসিভারের কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে গোপীমোহন অদ্ভুত-ভাবে একটু হেসে নিয়ে বললেন, 'খাটানোর মতো আমার উদ্বৃত্ত টাকা নেই। হ্যালো, কলকাতায় এখন সবই আছে, নেই শুধু টাকা। যুক্তফ্রন্ট এল—সাতষট্টির অবস্থা যে কি হবে একমাত্র কালী মা'ই জানেন।'

'তিনি কে দাদা?'

'কমিউনিস্ট। ছেড়ে দিলাম। বাংলাদেশে এখন তাঁরই রাজত্ব শুরু হল। বউমা যেন মাঝরাত্রি পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘুরে না বেড়ান। ইমপোর্ট লাইসেন্স জোগাড় করবার জন্য তাঁকে আর বড়কর্তাদের দপ্তরে পাঠিয়ো না।'

গোপীমোহন রিসিভারটা রেখে দিয়ে দেয়ালের নতুন ছবিটার দিকে দৃষ্টি তুললেন। ছেষট্টির ক্যালেণ্ডারের ছবিটা বাঁধানো হয়ে গিয়েছে। ছবিটা সুন্দর। একটি বিবস্ত্রা নারী দুই হাঁটুর মাঝখানে তানপুরা ঠেকিয়ে সুর ভাঁজছে। স্ত্রীলোকটির পেছন দিকে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র। অবাক হয়ে ভাবছেন, এ কোন্ ভারতবর্ষ! লেকের দিক থেকে হাওয়া লেগে আলনার কাপড়-চোপড়গুলো পড়ে গিয়েছে মেঝের ওপর। ঘরের মধ্যে যেন সত্যিকারের ওলোট পালট শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরনো দেশটা যেন ঠিক আর আগের মতো নেই। বালিগঞ্জের বাড়িগুলিতে কোটি কোটি ফাটল। তাঁর নিজের বাড়িটা তো এই অঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো প্রতিষ্ঠান। লেকের হাওয়া লেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বৈশাখের ঝড়ে কি যে এর অবস্থা হবে ভেবে আতঙ্কিত বোধ করলেন গোপীমোহন।

হাওড়া হাটের সস্তার গামছাখানা কোমর থেকে খুলে নিয়ে

মুখ মুছতে মুছতে কানাই এসে ঘরে ঢুকল। মেজাজটা বোধ হয় ভাল ছিল না ওর। আজ ক'দিন থেকেই ভাবছিল, দেশ থেকে একবার ঘুরে আসবে। কানাই বলল, 'বাবু. আমি একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে চাই।'

'হঠাৎ? এই তো সবে যুক্তফ্রন্টের রাজত্ব শুরু হল। আজ ক'দিন তো দেখছি সতুবাবুর সঙ্গে খুব ভাব জমেছে তোর। ভাবছিস যুক্তফ্রন্টের আমলে কাবু হয়ে পড়ব? তোদের দুজনকেই বাড়ি থেকে বের করে দেব।'

'বার করে দেবে কেন? হিসেবপত্র সব মিটিয়ে দাও আমার। আজ রাত্রেই গাড়ি ধরব।' রাগ দেখালো কানাই।

'বটে? সিন্দুকের চাবিটা নিয়ে আয়।'

সিন্দুকের চাবিটা নিয়ে আসতে দেরি করল না কানাই। মেঝের ওপর বসে পড়ে সিন্দুকটা খুলে ফেললেন গোপীমোহন। টাকা বার না করে এক গোছা কাগজ বার করলেন তিনি। বললেন, 'কানাই, দেখি চশমাটা দে তো আমার।'

'এই ক'টা টাকা গুণতে তোমার আবার চশমা লাগবে নাকি? চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি, যদি দু-একশো টাকা বেশি এসে যায় তো আসুক না।'

'না। দেখেশুনে গুণেগেঁথে দিতে চাই। ভুল করে একটা টাকাও বেশি দেব না। গুণে গুণে হাজার টাকা বেশি দিতেও আপত্তি নেই।'

'আমায় তুমি হাজার টাকা দেবে বাবু?' বিস্ময়ে চোখের মণি দুটো কপালের দিকে ঠেলে তুলে দিল কানাই। উবু হয়ে বসে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন গোপীমোহন।

কানাই ছুটে গিয়ে চশমাটা নিয়ে এল। তারপর আশার সুরে সে বলল, 'সতুবাবুর কিছু টাকার দরকার ছিল।'

তার কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে গোপীমোহন কাগজের গোছাটার ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন। এটা তাঁর উইলের খসড়া। চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ তিনি দেখলেন, আরশুলাদের একটা লম্বা মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সিন্দুকটার দিকে। বোধহয় ভেতরে ঢুকে সভা করতে চায় ওরা। দলিলের খসড়াটা হাতের মুঠোতে চেপে ধরে গোপীমোহন ভাবলেন, এদের সভাপতিত্ব করবার জন্য সতু একদিন ছুটে আসবে এখানে। যতদিন না আসছে ততদিন তিনি ওৎ পেতে বসে থাকবেন। তারপর যখন সে ভেতরে ঢুকে সভাপতির আসনটি দখল করে বসবে তখন তিনি বাইরে থেকে সিন্দুকের দরজাটা দেবেন বন্ধ করে। পুরনো আমলের বিলেতী সিন্দুক। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের দ্বারা তৈরি বলেই ফুটোফাটা কিছু নেই। তিলে তিলে দম আটকে মারা যাবে সতু। মারা যাবে ওর চিন্তা। লেবেলহীন শত্রুর সঙ্গে কি করে লড়াই করতে হবে তার কৌশলটা হঠাৎ যেন অধিকার করে ফেললেন গোপীমোহন। এ ভগবানেরই দয়া। তিনি দয়া না করলে মেঝের ওপর শুধু উঁচু হয়ে না বসলে কৌশলটা নজরে পড়ত না তাঁর। দমকা হাওয়ার মতো সহসা হেসে উঠলেন গোপীমোহন। বেঁচে থাক পরিমল—কমরেড পরিমল সিংহ। লঙ লিভ মাই সন! হো-হো করে হাসতে লাগলেন তিনি। ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কানাই। বাবুর বোধ-হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ঘরের বাইরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

দলিলের খসড়াটা হাতে নিয়েই মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন গোপীমোহন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কী সাংঘাতিক মজবুত সিন্দুক তৈরি করে রেখে গিয়েছে! এখানে ঢুকলে সতুর সঙ্গে সঙ্গে আরশুলাগুলোও দম আটকে মারা যাবে। এই সিন্দুকের মধ্যেই ইতিহাসের উত্তর মীমাংসা নিহিত রয়েছে। মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিতে দিতে গোপীমোহন বলে উঠলেন, 'ডেথ্ টু সতু!'

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হো! হো! হি! হি! লঙ লিভ মাই সন! লঙ লিভ কমরেড পরিমল সিংহ!

কানাইকে কেউ আঘাত করে নি, তবু সে একপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ওর মনে হল, পাতালের ঢাকনিটা বুঝি খুলে গিয়েছে। কোটি কোটি কাল কেউকে ফণা তুলে এগিয়ে আসছে গোপীবাবুর দিকে। দংশনের মুহূর্তটা পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো টলমল করছে!

গত কয়েক মাসের মধ্যে সুশীলার সঙ্গে দেখা হয় নি সতুর। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে কানাইদার কাছে খবর পেত যে, সুশীলা ওকে টেলিফোন করেছিল। তা সত্বেও সত্যপ্রকাশ তার খবর নেয় নি।

আজ সুশীলা নিজেই একটা মস্ত বড় আমেরিকান গাড়িতে চেপে পূর্ণদাস রোডে এসে উপস্থিত হল। বাড়ির সামনে এসে বুড়ো ড্রাইভারটা হর্ন বাজাতে লাগল।

দোতলার জানালা দিয়ে গোপীমোহন আমেরিকান গাড়ি আর মাড়োয়ারীর বউটিকে দেখলেন। তিনি তাড়াতাড়ি একতলায় নেমে এসে ঢুকে পড়লেন সত্যপ্রকাশের ঘরে। উপুড় হয়ে শুয়ে সতু কবিতা লিখছিল। তাকে একটা ধাক্কা মেরে গোপীবাবু বললেন, 'কবি তবে এবার উঠে এসো—'

'কেন?' উপুড় হয়ে শুয়েই প্রশ্ন করল সতু।

'কোটিপতি মাড়োয়ারীর বউ তোমায় ডাকছে।'

'কে! সুশীলা? এই সেরেছে!' লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সত্যপ্রকাশ। আলনা থেকে আণ্ডারওয়্যারটা টেনে নিয়ে বলল সে, 'বাবা, তুমি একটু বাইরে যাও—জামাকাপড় পরব।'

গোপীমোহন বেরিয়ে এলেন বাইরে। যুক্তফ্রণ্টের আমলে বাড়ির দরজায় আমেরিকান গাড়ি এসে অপেক্ষা করছে, ব্যাপারটা তাঁর ভাল লাগল। ছোঁড়াটা এখনো সাবালক হল না। কোটি-

পতির বউয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, অথচ ল্যাঙ্গটের মতো আঁটো করে আণ্ডারওয়ার পরল সে। পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করলেন তিনি। ধমকের সুরে বললেন, 'অতো আঁটো করে জামাকাপড় পরেছিস কেন? ব্যাটলফিল্ডে চলসি না কি?'

'চারদিকে বড্ড বেশি গোলমাল, বাবা—'

'তাতে তোমার কি?'

'একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।'

'কেন, তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে? পেট ভরে খাচ্ছ দাচ্ছ, কাজকর্ম কিছু করতে হচ্ছে না।'

'কবিতা লিখতে হচ্ছে—খুবই কঠিন কাজ, বাবা। চিন্তার জগতে একটা মীমাংসা খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'ভবিষ্যত্যের?' চোখের মণি দুটো ওপর দিকে ঠেলে দিলেন গোপীবাবু।

'উত্তর মীমাংসা—সরো, যেতে দাও।'

'দাঁড়া। সেটা বরং ইতিহাসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরি করা ভাল। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে আবদ্ধ থাকলে চিন্তার মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন আসবে।'

'ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা কে কবে অফিসে কাজ করেছিলেন?'

কথাটা এমনভাবে বলে ফেলল সত্যপ্রকাশ যে, গোপীমোহন আর বিদ্রূপের সুরে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করতে পারলেন না। সত্যপ্রকাশের কণ্ঠস্বরে বিচিত্র একটা গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলেন তিনি। এই ধরণের গাম্ভীর্যকেই ভয় পান গোপীমোহন। আজ আর তাই তিনি সতুর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করলেন না। সতুকে পথ ছেড়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। ইতিহাসের মোড়ের মাথায় নানারকমের গণ্ডগোল। গোপীমোহনও যেন নিজের মনে একটা মীমাংসা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। সত্যপ্রকাশ যন্ত্রী,

বাণ্ট, যন্ত্র। গোপীমোহনের ওয়ারিশ এরা। সিংহ পরিবারের পরিচয় বহন করার আর কেউ নেই। এদের কথা ভেবেই তিনি লাখ লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছিলেন। না খেলেও আর্থিক কষ্ট তাঁর হতো না। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি। সকলেই তাঁকে সম্মান করত। কত লোভ তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এইসব চাকরিতে প্রতি পদে পদে লোভ থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তান-সন্ততিদের সুখ-সুবিধার কথা ভেবেই তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ঘুষের টাকা পুঁতে রেখেছিলেন মাটিতে। এখন দেখছেন, সেই মাটিটাই পায়ের তলা থেকে আলগা হয়ে গেল!

পুরোপুরি আলগা হয়ে যাওয়ার আগে তাঁকেও একটা মীমাংসায় পৌছতে হবে। ইতিহাসের মোড়ের মাথায় কি হচ্ছে তা তিনি জানেন না। কিন্তু কলকাতার মোড়ের মাথায় যে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে সেকথা ঠিক। এখানকার মোড়ে যা ঘটে বাংলাদেশের সবগুলো মোড়েও তাই ঘটে।

লড়াই করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগলেন গোপী-মোহন।

গাড়িতে উঠে বসল সত্যপ্রকাশ। সুশীলার মুখে হাসি নেই। অদ্ভুত সাজসজ্জা করেছে আজ। বক্ষ আর কোমরের মাঝখানটা শাক আলুর মতো সাদা আর চর্বিহীন। কোমরে এক গোছা চাবি ঝুলছে।

সুশীলা বলল, 'চলো, বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে। সবচেয়ে বড় গাড়িটা এনেছি। পালঙ্কের মতো পিছনের গদিটা বড়।' একটু থেমে সুশীলাই আবার বলল, 'বন্ধুকে তো কথা দিয়েছিলে আমায় দেখাশোনা করবে। বাইরের দিকে মুখ করে কি দেখছ, সতুবাবু?'

'মিছিল।'

বালিগঞ্জ পার হল গাড়িটা চলে এসেছে পার্ক সার্কাসের দিকে।

বিরাট একটা মিছিল সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে পুবদিক থেকে এগিয়ে আসছিল। সামনে রয়েছে বান্টু। হাতে তার লাল ঝাণ্ডা। দড়ির মতো দেহটাকে মোচড়াতে মোচড়াতে শ্লোগান দিচ্ছে সে, 'ইন্-ক্লাব জিন্দাবাদ।'

অত্যন্ত সাবধানে আর ধীরে ধীরে গাড়িটা চালাতে লাগল বুড়ো ড্রাইভার।

সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ, ভাবী?'

'বেড়াতে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকে।'

'রতিলালের চিঠি পেয়েছ?'

'পেয়েছি।' দু'জনের মাঝখানে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। শেয়ালদা স্টেশনটা পার হয়ে যাওয়ার পর সতুর দিকে হেলে বসল সুশীলা।

'কি লিখেছে? কবে ফিরবে?' জিজ্ঞাসা করল সত্যপ্রকাশ।

'ওর ম্যানেজাররা কিংবা চাকর বাকররা বলতে পারবে। গত চারমাসের মধ্যে দু'খানা চিঠি লিখেছে। আমি একটাও খুলিনি।' সতুর দেহের সঙ্গে নিজের দেহটা এবার ঠেকিয়ে দিয়ে সুশীলা জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু তোমায় চিঠিপত্র লেখে নি?'

'না।'

'আমি যদি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতাম তা হলে তার জন্য কী-ই না করতে পারতাম!'

'কি করতে? চাবিগুলো সরাও, আমার গায়ে ঘষা লাগছে। এগুলো নিয়ে বেরিয়েছ কেন?'

'কি করব, রতিলাল শালা লক্ষ লক্ষ কালো টাকা লুকিয়ে রেখে গিয়েছে বাড়িটাতে। আমাকে আগলাতে হচ্ছে।'

'তা হলে চলো, পুলিস-মন্ত্রীকে খবর দিয়ে দিই।'

'ওরা আমাদের বাড়ি সার্চ করবে না। গতকাল আমাদের পাশের বাড়িতে সার্চ হল। সের খানেক সোনা পেয়েছে। চুনোপুঁটি।

কিন্তু সার্চ করবার জন্য শ-দুই পুলিস এসেছিল। গত পনেরো-ষোল বছরের মধ্যে আমাদের দু দিকের বাড়িতেই সার্চ হল। হল না শুধু আমাদের বাড়ি—দেখি তোমার হাতটা দাও।'

'কেন ?'

'চাবিগুলো তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে আজকের মত আমি নিশ্চিন্ত থাকতে চাই।'

'কি নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে ?'

'তোমাকে নিয়ে। বন্ধুত্ব আমি করতে জানি। আমার বন্ধুত্বের মধ্যে পাপ ভি আছে পুণ্য ভি আছে।' চাবির গোছাটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে নিজের হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে রেখে দিল সুশীলা, 'যখন দেব তখন উজাড় করে দেব।'

'আমি না নিলে তুমি আর দেবে কি করে। যশোর রোড ধরে কোথায় চললে ?'

'দমদম। চল দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসি। যদি ভাল লাগে দু দিন থেকে যাব। না হয় কাল আবার ফিরে আসব। ওব্‌রাই হোটেলের ম্যানেজার মিস্টার গ্রেভার আমাদের বন্ধু।'

'দার্জিলিং যাওয়ার প্লেন নেই এখন।'

'তুমি কী বোকা সতু। এই নাও টাকাগুলো তোমার কাছে রেখে দাও। হোটেলের বিল দেবে তুমি। পুরুষমানুষের হাত থেকেই ম্যানেজারের টাকা নেওয়া ভাল।' হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একগোছা একশো টাকার নোট সতুর ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে সতুর হাতটা চেপে ধরে রাখল সুশীলা। হাঁটু দুটো একসঙ্গে দোলাতে দোলাতে সতু জিজ্ঞাসা করল, 'প্লেন কই ?'

'দু-একটা প্লেন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মাল বহনের জন্য রতিলাল গোটা দুই প্লেন কিনেছে। একটা নিয়ে চলে যাব আমরা। সতু, তোমায় আমি সব শিখিয়ে দেব—'

'কি শিখিয়ে দেবে ?' সুশীলার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল সতু।

'প্লেন চালানো। আমার লাইসেন্স আছে। কী না জানি আমি! অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে লেখাপড়া শেখবারও সুযোগ পাই নি। তারপর বাড়িতে বসে সব কিছু খিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে গুটিপাঁচ সন্তান পয়দা করে ফেলল রতিলাল। শালার আর মন বসল না। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার আর সময় কাটে না। আমাকে কেউ বলেনি বটে, কিন্তু আমি জানি রতিলাল ব্যাটা ব্যবসার নাম করে পৃথিবী ঘুরছে আর নতুন নতুন মজা লুটছে।'

'সেই কথা ভেবেই বোধ হয় তুমি বেশী হাঁপিয়ে উঠেছ। দেহের ক্ষুধার চেয়ে মনের ক্ষুধাই বেশী তোমার। সবসুদ্ধু কটি সন্তান তোদের সুশীলা?'

'সাতটি।'

বিমান-ঘাঁটিতে ঢোকবার মুখে সতু বলল, 'তোমার সঙ্গে দু-চারদিন দার্জিলিঙে কাটিয়ে এলে আমার কোনও ক্ষতি হত না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি। সে এখনও সন্তানের জননী হয় নি। কলেজে পড়ে। প্রেমে পড়বার মত চেহারা আর শরীর।' সুশীলাকে এড়াবার চেষ্টা করল সতু।

'তা হোক। আমার কি আছে তা তো তুমি জান না সতু।'

'কি আছে?' ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল সত্যপ্রকাশ।

'আছে ব্যর্থতা। আর কি করে জীবনের দীর্ঘ পথটা অতিক্রম করব তার দুশ্চিন্তা। সতু, আমার বয়স খুব কম। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি রতিলালকে আমি ঘৃণা করি। রাস্তার কুত্তার চেয়েও বেশী ঘৃণা করি। প্রমাণ চাও? চল, পুলিস-মন্ত্রীর কাছে। কালো টাকার গোটা ঝুড়ি ভাণ্ডারের চাবি আমি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আসছি। আমি সামনে দাঁড়িয়ে গ্রেপ্তার করাব ওকে—'

'পুলিস ইচ্ছে করেই ভুল করবে। রতিলালের বদলে গ্রেপ্তার করবে মাণিকলাল নামে অন্য কোনও ব্যক্তিকে। সে কথা থাক।'

'কি কথা শুনতে চাও তবে? রতিলালকে আমি ডিভোর্স করতে চাই কিনা? তুমি একটি বালক সতু। আইন পাস হওয়ার আগেই মনে মনে আমি ওকে ডিভোর্স করে দিয়েছিলাম। তুমি দার্জিলিং যেতে না চাইলেও ডিভোর্স ওকে আমি করবই। আমার টাকা কিংবা শিক্ষার কোনও অভাব নেই। অতএব তুমি ভেবো না বাকী জীবনটা আমি শুধু হা-হুতাশ করব আর মন্দিরে গিয়ে চোখের জল ফেলব। ভারতবর্ষের কোনও মন্দিরই আমি চিনি না। মাড়োয়াড়ীর রাজ্যে মন্দির নেই সতু।' চোখের জল ফেলতে লাগল সুশীলা।

শীতের সন্ধ্যা। পুরোপুরি অন্ধকার না হলেও বিমানঘাঁটির চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। রতিলালদের বুড়ো ড্রাইভার সামনের দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এর আগেও আমেরিকান গাড়ির পেছনের সীটে বহু রকমের ঘটনাই ঘটে গিয়েছে, কিন্তু তাতেও এই ড্রাইভারটির গাড়ি চালাতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

মাথার ওপর দিয়ে দু-একটা উড়োজাহাজ উড়ে চলে গেল। দু-একটা আবার নেমেও পড়ল। যাত্রীদের গাড়িও একটা চলে গেল পাশ দিয়ে। প্রাইভেট গাড়িও যাওয়া-আসা করছে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি পার হয়ে যেতেই সতু আর সুশীলা একসঙ্গেই দৃষ্টি ফেলল সেই দিকে। মনে হল রতিলাল বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটাতে। ওর পাশে বসে রয়েছে একটি মেয়ে। কোনো কথা বলল না সুশীলা। হু হু করে কাঁদতে লাগল শুধু। লম্বা হয়ে সতুর হাটুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে।

গাড়িটাকে পূর্ণদাস রোডের দিকে ঘুরিয়ে নিতে বলল সত্যপ্রকাশ। আজ আর রতিলালের বাড়ি গিয়ে লাভ নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য করে চার মাস পরে বাড়ি ফিরছে সে। তপতী রায় ওর পাশে বসে নিউইয়র্ক থেকে ফিরে এলেও রতিলাল আজ সুশীলাকেই

চাইবে। রতিলালের সময় নষ্ট করা ওর উচিত হবে না। সতুর নিজের চোখ দুটিও আর শুকনো নেই। টের পেয়ে সুশীলা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে ওর চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমায় তুমি ক্ষমা করো, সতুবাবু।'

'অপরাধ কিছু তো করোনি।'

পূর্ণদাস রোডে বাড়ির সামনে এসে সুশীলা বলল, 'সতুবাবু, চাবিগুলো আমায় দিয়ে দাও। টাকাগুলো থাক তোমার কাছে।'

'আমি কি করব টাকা দিয়ে?'

'তোমার তো হাজার দুই টাকার দরকার ছিল বলেছিলে—'

'আর দরকার হবে না।' সুশীলাকে চাবি আর টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ আজ কি মনে করে এখানে চলে এসেছিলে?'

'সত্যি কথা শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ।' সুশীলার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সত্যপ্রকাশ।

'একজন কো-রেসপনডেণ্ট খুঁজতে। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় রতিলালকে একজন মোকাবিলা প্রতিবাদী দিয়ে সাহায্য করতে চাই। তুমিই তার মোকাবিলা প্রতিবাদী, সতু। গুড নাইট। চলো ড্রাইভার।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চলন্ত গাড়িটার দিকে চেয়ে রইল সত্যপ্রকাশ।

যুক্তফ্রন্ট শাসনভার নেওয়ার পর গোপীমোহন পণ্ডিতিয়া রোডেও আর যান নি। সুনন্দাকে বলে এসেছিলেন, পরিমলের বুকের একটা ছবি তোলাবেন—কার্ডিওগ্রাফ। খরচ পড়বে চৌষট্টি টাকা। নিজের পকেট থেকে টাকাটা বার করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই দামী ওষুধটাও কিনে নিয়ে

যাবেন বলে কথা দিয়ে এসেছিলেন। বলে এসেছিলেন 'বউমা, একেবারে দু-মাসের স্টক তুলে দেব।'

সুনন্দা কোনো মন্তব্য প্রকাশ করে নি।

যুক্তফ্রন্টের পরে ওদিকে আর যান নি গোপীমোহন। তাঁর ধারণা, পরিমল ওষুধ না খেয়েই সুস্থ হয়ে উঠেছে। বুকের ছবি নেওয়ারও আর দরকার নেই। মানুষের সবচেয়ে বড় ওষুধ হচ্ছে আশা। বোধহয় পুরো পরিবারটিরই রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। আশার আলো দেখতে পেয়েছে ওরা।

সেই কারণেই এক বাক্স দামী ওষুধ পড়ে রইল এখানে। কলকাতার অলিতে গলিতে হার্টের রোগী।

পুরো বাক্সটাই দান করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন গোপীমোহন। রোগীর অভাব হবে না। খবর পেলেই তারা এসে নিয়ে যাবে। না হয় তিনি নিজে গিয়েই পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছে হয় না। বোধহয় বান্টু আর মিছিল নিয়ে রাস্তায় বেরোয় না। বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আগে তো একটা রবিবারেও বাদ যেত না। খ্রীষ্টিয়ানদের গীর্জায় যাওয়ার মতো বান্টুও প্রতি রবিবার নিয়মিত বিক্ষোভ প্রদর্শন করত।

আজ ক'মাস থেকে নতুন বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কলকাতার দেওয়ালে আর খবরের কাগজে শুধু একটা কথাই বার বার দেখতে পাচ্ছেন তিনি—ঘেরাও। তাঁকে কেউ ঘেরাও করতে আসে নি, তবু তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যান। এটাই তাঁর পুরনো ব্যাধি। চারটি দেওয়াল আর একটি সিলিং যেন তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টাই ঘেরাও করে রেখেছে। কেটে বেরুবার পথ পান না গোপীমোহন।

গতকাল থেকে সতুও বাইরে বেরোয় নি। একতলার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে নাকি একটা কবিতা লিখছে। মাঝে মাঝে খবর নেন। কানাই এসে বলে যায়, 'এখনো শেষ হয় নি।'

'চব্বিশ ঘণ্টা যে হয়ে গেল রে। লম্বা কবিতা বুঝি?'

'লম্বা না ভারা আমি কি করে বলব? আজ ক'দিন থেকে তুমি কেন বাড়ি বসে রয়েছে, বাবু? বামপন্থীরা মন্ত্রী হয়েছেন বলে তুমি রাগ করছ?'

'কার ওপরে রাগ করব? রাগ করতে গেলেই তো তোরা সকলে মিলে ঘেরাও করতে আসবি। দাদাবাবুকে একবার আসতে বলিস।'

'কাল থেকে বলছি—'

এই সময় সত্যপ্রকাশ ঘরের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আসব বাবা?'

'আয়, আয়। কাল থেকে উপুড় হয়ে শুয়ে কি লিখছিস? হার্ট খারাপ হবে না?'

'একটা কবিতা লিখেছি, বাবা।'

'বিষয় বস্তু?'

'ঘেরাও।'

রুপোর তৈরি খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে গোপীমোহন বলতে লাগলেন, 'এই ত্থাখ—কাগজ থেকে হিসেব করে কি বার করেছি ত্থাখ। চারশো পঞ্চাশটা কারখানা বন্ধ হয়েছে, প্রায় আড়াই লক্ষ কর্মী বেকার হয়েছে, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় পনেরো পারসেন্ট ঘাটতি চলছে—আমরা বাঙালীরা সকলেই এক-একটি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসেছি। বাকী ছিল একটা কবিতা লেখা। সেটাও শেষ করেছিস দেখছি।'

'তপস্যা করতে হয়েছিল বাবা।' কাগজখানা গোপীমোহনের সামনে মেলে ধরল সতু।

'তপস্যার ফল মাত্র চার লাইন!'

'তাই থেকেই তপস্যার কোয়ালিটি প্রমাণিত হচ্ছে। বাবা, তুমি তো গীতা পড়েছ?'

'পড়েছি।'

'অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, লোভের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে এত বড় একটা ধর্মাস্ত্র আর কে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর এই যুগে দেখতে পাই যুক্তফ্রন্ট। ঘেরাও অস্ত্র হচ্ছে অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত আর হতভাগ্যদের হাতে সুদর্শনচক্র। সাহস থাকে এসো, ধর্মযুদ্ধে যোগ দাও। কোন্ দলে যোগ দেবে, বাবা? এখনো সময় আছে, সাবধান হও, সতর্ক হও, সংযত হও—কালো টাকার বাণ্ডিলগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও। বড়দার চিকিৎসা করাও, বউদিকে দশ ডজন শাড়ি কিনে দাও, বান্টুকে নিয়মিত পশু-প্রোটিন খাওয়াও—ত্যাগ ও কর্মসাধনার দ্বারা নিজেকে নিস্পৃহ করে তোলো। ব্রহ্মচর্য পালন করো—মায়ের মৃত্যুর পর থেকে এতো বেশি পশু-প্রোটিনের সঙ্গে মদ্য পান করছে যে, সেরকম খেলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুণিও ধ্যানভঙ্গ করে সাংঘাতিক ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠতেন। বাবা, এক্ষুনি আমায় হাজার দুই টাকা দাও। চেক্ নেব, দাও। বড়দার অবস্থা শোচনীয়—'

'যুক্তফ্রণ্টের আমলে তার তো সুস্থ হয়ে ওঠার কথা রে।'

'যুক্তফ্রণ্ট ওষুধের কারখানা খোলে নি।'

'এই আমলে কারখানা সব বন্ধ হচ্ছে—' দক্ষিণ দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে গোপীমোহন বললেন, 'এখন থেকে সাবধান হতে হবে। দিনকাল খারাপ। মাছ, মাংস আর সব্জি কিনতেই ফতুর।'

'তা হলে টাকা দেবে না?'

'টাকা না দিই ওষুধ দেব। হ্যাঁরে, বান্টু কেমন আছে? শোভাযাত্রা নিয়ে এখানো পথে বেরুচ্ছে কি?'

'কুরুক্ষেত্রে না পৌঁছনো পর্যন্ত শোভাযাত্রা চলবে—চলছে।

বউদি তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা বাবা, তুমি নাকি আরো তেতাল্লিশ বছর বাঁচবে? কানাইদা বলছিল।'

জন্ম-মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। তবে হ্যাঁ, বাঁচবার চেষ্টাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় চেষ্টা।'

'তোমার যা টাকা আছে শুনেছি তাতে আরো একশ তেতাল্লিশ বছর বেঁচে থাকবার খরচ কুলিয়ে যাবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সতুই বলল, 'আমরা তোমার সন্তান হিসেবে জন্মালুম, অথচ তোমার টাকার কোনো সুবিধে পেলুম না। তুমি নিজেই নিজের ওয়ারিশ। আমরা মরে ভূত হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি বত্রিশ সনের ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়াবে। ভাবছি, আমি আর কানাইদা তোমাকে ঘেরাও না করে যমরাজাকে ঘেরাও করে বসে থাকব। তিনি যদি দয়া না করেন তাহলে তো দেখছি আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আচ্ছা বাবা, তুমি নাকি মাকে ধাক্কা দিয়ে লেকের জলে ফেলে দিয়েছিলে?'

'কে বলল?'

'গুজব শুনেছি।'

'গুজবে কান দিতে নেই।' হাঁটতে হাঁটতে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন গোপীমোহন। ড্রয়ার খুলে একটা ওষুধের বাক্স বার করলেন।

সত্যপ্রকাশ খপ্ করে বাক্সটা ধরতে যাচ্ছিল। গোপীমোহন সেটা নিজের হাতে ধরে রেখে বললেন, 'আমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। অনেকদিন যাই নি। দেশের সোসিও-ইকনমিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এখন—নিজের চোখে গিয়ে দেখে আসব। হ্যাঁরে সতু, কানাই বলছিল, তোর গীতা বউদি নাকি আত্মহত্যা করেছেন? সত্যি নাকি?'

'আত্মহত্যা না করলে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না।'

'তার আত্মহত্যার জন্য তুই-ই নাকি দায়ী?'

'আমায় কিছু বলে যান নি।'

'দেবদাস টেলিফোন করে বলছিল, তার চেক্-বইতে তোর নামে একটা পাঁচ হাজার টাকার চেক্ দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে। সাবধানে থাকিস। পুলিশের প্যাঁচে পড়ে যেতে পারিস।'

'কলকাতার পুলিস অতো বোকা নয়। টাকা আমি নিই নি। কেন নেব? আমার বাবার শয়ন-কামরার দেওয়ালে লাখ লাখ টাকা রয়েছে, পরের কাছে হাত পাতব কেন? বাবা, বিকেলবেলা তুমি যদি ওষুধের বাক্সটা পৌঁছে দিয়ে না আস, তা হলে বাণ্টুর দলবল নিয়ে এখানে আমরা আসব। তোমাকে ঘেরাও করব। জেনে রেখো, কুরুক্ষেত্রের পরে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ ধর্মাস্ত্র। আমি এখন চললুম—কবিতাটা শোনাতে হবে। পৃথিবীর সর্বহারারা অপেক্ষা করছে। বাবা, কাল থেকে গেটে একটা দারওয়ান বসিয়েছ কেন?'

'এখানে তোর আর অবাধে যাওয়া-আসা করা চলবে না। আজ থেকে দারওয়ানের হাতে বন্দুক থাকবে।'

'আমায় এখানে পাস নিয়ে ঢুকতে হবে? পিতা-পুত্রের স্বাধীন সম্পর্কটাকে তুমি অস্বীকার করছ? বেশ, আমি আর আসব না।'

'এই যে বললি ঘেরাও করতে আসবি?'

'তখন আর পুত্র হিসেবে আসব না। দাও' ছোঁ মেরে ওষুধের বাক্সটা আবার তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল সতু। গোপীমোহন সতর্ক ছিলেন। ওর নাগালের বাইরে বাক্সটাকে সরিয়ে রেখে বললেন, 'তোদের জন্ম দিয়েছি আমি, বাঁচিয়ে রাখব আমি। চললি সতু?'

'এখন যাব না। একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে বেরুবো। কানাইদা আজ দেড় কেজি ওজনের একটা গঙ্গার ইলিশ এনেছে—না খেয়ে যাই কি করে, বাবা? তুমি কি আমায় যেতে দিতে পারো? আজ আমি যাচ্ছি হাওড়ায়। সেখানকার একটা মস্ত বড় কারখানার জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করবে

বান্টুরা। আমাকে যোগ দিতে বলেছে। বাবা, এ মাসের পকেট-খরচের টাকাটা কি এখন দিতে পারো? মা বেঁচে নেই। তাঁর কাছ থেকে যে লুকিয়ে লুকিয়ে দু'পাঁচটা টাকা চেয়ে নেব তারও পথ তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। বান্টুরা সকালের দিকেই পায়ে হেঁটে হাওড়ার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। আমাকে যেতে হবে ট্রামে চেপে। পকেটে একটা পয়সাও নেই। আমার পকেট-মানি তুমি বন্ধ করবে কেন? কোন্ আইনের জোরে তুমি বন্ধ করতে চাও? আমরা মাতৃহারা। এখম তুমি জবরদস্তি আমাদের পিতৃহারাও করতে চাইছ। যদি পকেট-মানিও না দাও তাহলে তোমাকে আমরা পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করতে দেব কেন? আমরা কি জল দিয়ে ভেসে এসেছি? দাও—'বাক্সটা নিয়ে নেওয়ার জন্য তৃতীয়বার চেষ্টা করল সতু। কিন্তু এবারেও সে অকৃতকার্য হল। তারপর বলল, 'দাদা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে!'

ইস্কুলে কাজ করতে যায় নি প্রায় দু'মাস হল। ঘরে শুয়ে রয়েছে পরিমল। ডাক্তার বলেছেন, আরো মাস তিন কাজ করা চলবে না। তা সত্বেও ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ দু মাস ওকে মাইনে দিয়েছেন। কিন্তু এ মাস থেকে আর মাইনে দেওয়া চলবে না। কর্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করে জানিয়েছেন যে, পরিমল কর্মক্ষম হয়ে উঠলেই আবার তাঁরা তাকে নিয়োগ করবেন। এ সম্বন্ধে পরিমল নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

বান্টুও খবরটা শুনেছে। এখন প্রায় চোদ্দ বছর বয়স হল ওর। ডান পা-টা খোঁড়া। এখনো অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমার দিন হাঁটুতে ব্যাথা হয়। রগটাতে টান ধরে। গায়ে খেটে যে পয়সা রোজগার করে আনবে তেমন সম্ভাবনাও নেই।

বান্টু বলেছিল, 'মাগো, আমাদের মন্ত্রীরাই তো এখন রাজত্ব করছেন, তাঁদের বলো আমায় একটা কাজে লাগিয়ে দিতে। আমি জানি, আমার কোনো বিদ্যে নেই, কাজ দিতে খুবই অসুবিধে হবে।

কিন্তু আজকাল তো বেয়ারা-চাপরাসীরাও আশি-নব্বই টাকা মাইনে পায়। আমি বেয়ারা-চাপরাসীরও কাজ করতে পারব না? সংসারে এখন টাকার দরকার। মাগো, আজ তুমি আমায় কমরেড বন্ধুর কাছে নিয়ে চলো। টাকা রোজগারের মধ্যে মান-অপমানের প্রশ্ন নেই।'

'দেখি, সতু আসুক।'

'কাকুর ওপর তো কিছুই নির্ভর করছে না—'

'তবু একটু পরামর্শ করা দরকার।'

কয়েকদিন থেকে সভাসমিতি কিংবা মিছিলের সঙ্গে যোগ দেয়নি বান্টু। শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য গোটা কয়েক ঘেরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।

এখন কদিন থেকে ঘরে বসে আছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই 'বউদি, বউদি' বলতে বলতে সত্যপ্রকাশ এসে উপস্থিত হল। ওরা তিনজনেই ঘরে ছিল। পরিমল হেলান দিয়ে বসে একটা হাল্কা ধরণের বই পড়ছিল। ভারী বই পড়বার বারণ ছিল ওর।

সত্যপ্রকাশ বলল, 'দাদা, তোমাদের হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ভারি ভালমানুষ। ভেবেছিলুম তুমি পার্টির লোক বলে হয়তো প্রস্তাবটা আমার প্রত্যাখ্যান করবেন—'

'কি প্রস্তাব রে?'

'বললাম যে, দাদাকে বিনে মাইনেতে তিন মাসের ছুটি দিন। আমি এই তিন মাস শিক্ষকতার কাজ করব। তোমার মতো বেশি মাইনে আমি পেতে পারি না। তাছাড়া আমি বি-টি পাসও করিনি। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনে বললেন যে, তিন মাসের জন্য বি-টি পাস না হলেও চলবে। আগামীকাল থেকে আমি পড়াতে যাচ্ছি।'

'কাকু, আমিও একটা চাকরি করব'

'কি কাজ করবি রে তুই?' জিজ্ঞাসা করল সত্যপ্রকাশ।

'কেন, তোমাদের ইস্কুলের ঘণ্টা বাজাবার কাজ।'

'রাজনীতির জগতে তুই হচ্ছিস গিয়ে একটা মার্কামারা ফিগার। তোকে ওঁরা নেবেন না।'

'কেন নেবেন না কাকু?'

'তুই হয়তো সকালবেলা থেকেই ছুটির ঘণ্টা বাজাতে থাকবি।' হাসতে হাসতে সতু জিজ্ঞাসা করল, 'আজ তুমি কেমন আছ, দাদা?'

'ভালই।'

'বুকের একটা ছবি তোলার দরকার ছিল। যাক, দেখা যাক কি করা যায়। আমি এখন ষোল আনা সক্রিয়। তোমার এই অসহায় অবস্থাটা স্বচক্ষে না দেখলে বাস্তব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমার হতো না! তুমি আর ওয়ারী করো না—এই অসুখটার প্রধান কারণই হচ্ছে দুশ্চিন্তা। বউদি, এই নাও চায়ের প্যাকেট। আমরা মদ, গাঁজা, সিদ্ধি ইত্যাদি কিছুই খাই না—শুধু চা খাই। তোমাদের ইউনিয়নের হাতেই ভারতবর্ষের চা বাগান বেশী। অতএব আমরা অবিশ্যি যদি পয়সায় কুলোয়, তা হলে কংগ্রেসী আমলের চেয়ে এই আমলে বেশি চা পান করব। কি হলো, বউদি?'

'তোমরা বসো, আমি চা তৈরি করে নিয়ে আসছি।' সুনন্দা গেল চা তৈরি করতে।

বাণ্টু বলল, 'গতকাল দাদুকে দেখেছি।'

'কোথায়?' জিজ্ঞাসা করল সতু।

'আমাদের রাস্তা দিয়েই গেলেন—মানে বড় রাস্তা দিয়ে। গলিটাতে ঢোকেন নি।'

'এখন তিনি ঢুকবেন না, যুক্তফ্রন্টের হাত থেকে শাসনভার চলে গেলে আসবেন।' বলল সতু।

'যুক্তফ্রন্ট শাসনভার পেল কবে রে, সতু?' সুনন্দা জল চাপিয়ে দিয়ে ভেতরে এসে বলল, 'বাবাও জানেন যুক্তফ্রন্ট শাসনভার পায়নি। সেই কারণেই ভোটযুদ্ধের পক্ষপাতী নই আমরা

ওভাবে শাসনকর্তৃত্ব পাওয়া যায় না, সতু।' সুনন্দা বেরিয়ে গেল বাইরে। সে জানে রাজনীতি নিয়ে কথা উঠলে সত্যপ্রকাশ বোকার মতো শুধু হাসে। দু-চারটে কথাবার্তা যা বলে তাও বোকার মতো বলে। এটা ইচ্ছাকৃত কি না সুনন্দা তা বুঝতে পারে না। এক এক সময় সন্দেহ হয়, ইচ্ছা করেই সে আবোল তাবোল কথা বলে। ওর যে রাজনীতির প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই সেটাই প্রমাণ করতে চায়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স, স্বাস্থ্যও খুব ভাল, মোটামুটি লেখাপড়াও শিখেছে, অথচ রাজনীতির আলোচনাও সে পরিহার করে চলে—ব্যাপারটা কেমন সুনন্দার চোখে অস্বাভাবিক ঠেকে। যারা রাজনীতি করে তাদের প্রতি সতুর বোধহয় কোনো শ্রদ্ধা নেই। সতুর কোনো লেবেল নেই বলে বাবা মাঝে মাঝে অভিযোগ করতেন। হয়তো তিনিও তাঁর ছোট ছেলেকে বুঝে উঠতে পারেন নি। লেবেলহীন মানুষকে ভয় পান তিনি।

সুনন্দার অবিশ্যি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। সতু যদি শুধু এখানে ঠাকুরপো হিসেবে আসে তা হলেই সে খুশি। বিশেষ করে সতু কাল থেকে ওর স্বামীর জায়গায় কাজ করতে যাবে। এই কাজটাই সে ভাল করে করুক—ওর মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন আসুক।

'কোথায়, বউমা কোথায়? এই যে—থাক, থাক, প্রণাম করতে হবে না। আমর মতো লোক তোমাদের প্রণাম পাওয়ার উপযুক্ত নয়। যার-তার পায়ে মাথা নত করবেই বা কেন? যুক্তফ্রন্টের আমলে পরিমলের হার্টের অবস্থা খারাপ হল কেন, বউমা? এখন কেমন আছে সে? ওষুধপত্র খাচ্ছে তো?' গোপীমোহন এসে উপস্থিত হলেন।

দাওয়ার ওপর মাদুর বিছিয়ে দিল সুনন্দা। তার হাতে নতুন একটা সিগারেটের প্যাকেট গুঁজে দিয়ে তিনি বললেন, 'এক বাক্স ওষুধ প্রায় দু'মাস আগেই কিনে রেখেছিলাম। আজো আনতে

ভুলে গেলাম! বাবু সত্যপ্রকাশ সিংহ মহাশয় দু'মাস আগে সেই যে বেরিয়ে গেলেন আর ফেরেন নি। কোথায় আছেন তাও খবর দেন নি। আচ্ছা বউমা, তোমরাই বা কেমন মানুষ? একবার খোঁজও তো নাও নি, এই লোকটা বেঁচে আছে কি না। আদর্শের দিক থেকে আমরা বিরুদ্ধ হতে পারি, কিন্তু সম্পর্কের দিক থেকে তো আমি তোমার শ্বশুর। অস্বীকার করতে পারো?'

'না।'

'তাহলে একবার যাও নি কেন? গেলে তো ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আসতে পারতে—সতুকে কতো অনুনয়-বিনয় করে বলেছিলুম, ওরে বর্বর কবি, তোর দাদার যে হার্টের ব্যারাম, ওষুধগুলো নিয়ে যা। এক একটা ট্যাবলেটের এক টাকা চার আনা করে দাম—প্রায় দু'মাসের স্টক। এতদিন পরে সেগুলোর পোটেন্সি আছে কি না কে জানে।'

'সতু তো দু'মাস আগে ওষুধগুলো নিয়ে এসেছিল। আপনার অনুনয়-বিনয় রক্ষা করেছিল। এখনো দুটো ফাইল ঘরে মজুত রয়েছে। সতু বলেছিল, পরিমলের জন্য আপনার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। ওষুধগুলো না পাঠানো পর্যন্ত আপনি স্বস্তি বোধ করতে পারছিলেন না। আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সময় খুব উপকার হয়েছিল আমাদের। মাসের শেষ। হাতে একেবারে টাকা ছিল না। আপনি বসুন বাবা, চা ভিজিয়েছি—সবাই চা খাচ্ছে। সকলেই বাড়ি আছে। বাণ্টু, সতু—'

'সতু?'

'হ্যাঁ বাবা, এখানেই কোনো রকমে দু'মাস গল্প করে কাটিয়ে দিল। আপনাকে দেখে নি বলে ছেলেটার সে কী মন খারাপ! এখনো শিশু, এখনো বাপের জন্য মন পোড়ে! মাঝ রাত্রে দু-একদিন কেঁদেও উঠেছিল।'

'উঠবেই তো। আমিই তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।'

'আপনি বসুন, আমি আসছি।'

সুনন্দা রান্নাঘরে ঢুকতেই সত্যপ্রকাশ বেরিয়ে এল। গোপীমোহনের পাশে এসে বসে পড়তেই তিনি ওর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'ইউ থিপ! চোর কাঁহাকার! ওষুধের বাক্সটা তুই চুরি করে নিয়ে এসেছিস? একদিনও আমি ড্রয়ারটা খুলে দেখি নি।'

'চুপ, বাবা! সেই বাক্সটার জন্য এঁরা তোমায় একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছেন। তোমার মাথায় আমি যে একটি শ্রদ্ধার মুকুট পরিয়েছি সেটা ভুল করে পথের ধুলোয় ফেলে দিও না।'

তা সত্ত্বেও তোকে আমি চোরই বলব। এ থিপ্ ইজ এ থিপ্। আমার ড্রয়ার থেকে কোন্ সময় বার করে নিয়ে এসেছিলি?'

'তুমি যখন চান করতে বাথরুমে ঢুকেছিলে।'

'বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দারোয়ান আটকায় নি?'

'বেরুবার সময় সে কাউকে আটকায় না। ঢোকবার সময় আটকায়। সেই দিন থেকে আমি আর তোমার বাড়িতে ঢুকিনি। এখন বর্তমান পরিস্থিতিটা হচ্ছে যে, ওঁরা জানেন ওষুধের বাক্সটা তুমিই পাঠিয়েছিলে। বউদি আর বাণ্টি, আমার বাবাকে এখন নতুন আলোয় দেখছে নতুন করে চিনছে। চিনিয়েছি আমি।' বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের বুকে খোঁচা মারল সত্যপ্রকাশ।

'কিন্তু সতু—' একটা সিগারেট ধরিয়ে গোপীমোহন বললেন, 'কিন্তু সতু, আমি যে একটি নৃশংস চরিত্রের লোক সেটাই তো ওদের আমি জানাতে চাই। সত্য গোপন করব কেন?'

'হঠাৎ তুমি সত্য প্রকাশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন, বাবা? লাখ লাখ টাকা লুকিয়ে রেখেছ, কই তা থেকে তো একটা টাকাও বার করতে চাও না? সেটা চেপে রাখতে যদি যন্ত্রণা অনুভব না করো, তাহলে এটা চেপে রাখতেই বা অসুবিধা কি?

বাবা, এ মাস থেকে দাদা আর মাইনে পাবে না। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ পুরো মাইনেতে দু মাসের ছুটি দিয়েছিলেন—'

'যথেষ্ট করেছিলেন তাঁরা। এখন তাহলে দেখছি উপোস করে মরবে—' মনে মনে খুশী হলেন গোপীমোহন। সত্যি সত্যি উপোস করতে আরম্ভ করলে পরিমল অবশ্যই তাঁর কাছে ছুটে আসবে। পরিমল যত বড় মার্ক্সবাদীই হোক না কেন, বিশ্ব সংসারে তাঁর ওপরে ছাড়া আর কারো ওপরেই নির্ভর করতে পারবে না। সেই মহা-মুহূর্তটার জন্য তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন। দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে সে ভেতরে ঢুকবে। কানাইয়ের অনুমতি নিয়ে দোতলায় উঠবে। তারপর তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে যখন বলবে, 'আমায় ক্ষমা করো' তখন তিনি চাল-ডাল কেনবার টাকা দেবেন পরিমলকে। একদিনেই বেশি টাকা দেবেন না। বার বার আসতে হবে ওকে। বার বার ক্ষমা চাইতে হবে। স্বীকার করতে হবে, 'একরামুল্লার বিবিকে বিয়ে করা উচিত হয়নি আমার।' সতু আজ কী সুন্দর একটা খবর দিল তাঁকে! পরিমল এ মাস থেকে বেকার হল।

'সন্দেশ খাবি, সতু?' জিজ্ঞাসা করলেন গোপীমোহন।

'হঠাৎ?'

'পরিমল বেকার হল—'

'সেই কাজটা তো আমি নিলাম। আমি টাকা দিয়ে কি করব? সব টাকা তুলে দেব বউদির হাতে। বাবা, যদি ইচ্ছে করি তাহলে আরো অনেক বেশি টাকা আমি রোজগার করতে পারব।'

'এমন একটি আদর্শ পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখাই সারা জীবনের ব্রত বলে ধরে নিয়েছ বুঝি?' দমে গিয়েছিলেন গোপীমোহন।

'তিন মাস পরে দাদা আবার কাজ করতে যাবে।'

খুব নিচু স্বরে এদের আলাপ-আলোচনা চলছিল। সেইজন্য বাণ্টু ভেবেছিল যে, বোধহয় গোপন কথাবার্তা হচ্ছে দাদুর সঙ্গে।

এবার সে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এতদিন আসনি কেন, দাদু ?'

'ভেবেছিলাম যুক্তফ্রন্টের আমলে তোরা বোধহয় রাজভবনের দিকে উঠে গিয়েছিস। রাস্তায় ঘাটে তোকে আজকাল দেখতে পাই না। মিছিল কি বন্ধ হয়ে গেল ?'

বাণ্টু বিব্রত বোধ করেছে দেখে সতু বলল, 'এসব মিছিল বন্ধ হওয়ার নয়, বাবা। অত্যাচার অবিচার আর শোষণ যতদিন থাকবে ততদিন পৃথিবীর রাজপথে মিছিলও বেরুবে।'

'আমি বরং নকশালবাড়ির মতো আন্দোলনই বেশি পছন্দ করি—' বলতে লাগলেন গোপীমোহন, 'এক কোপে সাবাড় করবার নীতি রয়েছে ওতে। কলকাতার আন্দোলনটা ঘুষঘুষে জ্বরের মতো সর্বক্ষণই ভোগায়। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরুবার উপায় থাকে না। শুধু মিছিল, মিছিল আর মিছিল। আজ গিয়েছিলুম হাইকোর্টে। সেখান থেকেই ফিরছি—' মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন গোপীমোহন।

সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো মামলায় জিতে এলে বুঝি ?'

'আমি জিতিনি। জয় হয়েছে ধর্মের। হাইকোর্টের ধর্মাবতার রায় দিয়েছেন ঃ ঘেরাও বে-আইনী।' রুপোর খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করে গোপীমোহন বললেন, 'বাণ্টু, পাঁচ টাকার উৎকৃষ্ট সন্দেশ কিনে নিয়ে আয়।'

বাণ্টু গেল সন্দেশ কিনতে।

'একথা তুই নিশ্চয়ই স্বীকার করবি সতু, শ্রীকৃষ্ণের হাতের চক্রটিতে যত ধর্মই থাক, কলকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির হাতে লেখা রায়টাতে কম ধর্ম নেই। তাছাড়া হাইকোর্টের বিচারপতিকে আমরা চোখে দেখতে পাই—রিয়েল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর হাতের চক্রটিকে কেউ দেখেছিল বলে তো ঐতিহাসিক

প্রমাণ কিছু নেই। ভাল সন্দেশ এনেছে বান্ট, বস্তির ঠিক মুখটাতেই দোকান। বস্তির নাগরিকরা ভাল সন্দেশ খায় রে, সতু। নইলে ময়রা কেন সন্দেশ তৈরী করতে যাবে? কই বউমা এসো, এসে সন্দেশ খাও! চা কি হয়নি?'

'হয়েছে বাবা। নিয়ে আসছি।' রান্নাঘর থেকেই বলল সুনন্দা।

'বুঝলি সতু—' সত্যপ্রকাশের দিকে একটু ঘুরে বসে গোপীমোহন বললেন, 'তোর চার লাইন কবিতা অনুসারে ঘেরাও অস্ত্রের মুখে যদি কুরুক্ষেত্রের ধর্ম থাকে তাহলে বাংলাদেশের আড়াই লক্ষ শ্রমিক আজ বেকার হতো না।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত—' দুহাতে দুটো চা-এর পেয়ালা নিয়ে সুনন্দা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। দাওয়ার ওপর রেখে দিয়ে বলল সে, 'ঘুষঘুষে জ্বর আমিও পছন্দ করি না। আপনি একটা সন্দেশ খান, বাবা।'

'খাব, নিশ্চয়ই খাব বউমা। হাইকোর্টে শুনে এলাম যুক্তফ্রণ্টে চিড় ধরেছে। গেল বলে—' খুক খুক করে কেশে উঠলেন গোপীমোহন।

'যাওয়াই তো উচিত। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিপ্লব নেই।'

'সত্যি বউমা, তোমার মধ্যে তেজ রয়েছে বটে! আজ চলি—অন্য একদিন আসব। আশাকরি ইতিমধ্যে পরিমল পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। সেই বিশেষ দিনটিতে দশ-বিশ টাকার সন্দেশ নিয়ে আসব। উঁকি দিয়ে একবার পরিমলকে দেখে যাই '

ঘরের ভেতরে উঁকি দিলেন গোপীমোহন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ, পরিমল?'

'মোটামুটি ভালই।'

'শুনলাম তো কাল থেকে বেকার হচ্ছ—'

'সতু যাবে কাল থেকে।'

'মাষ্টার হবে বলে সতু জন্মগ্রহণ করে নি। তা ছাড়া সতুর উপার্জন দিয়ে তুমি জীবনধারণ করবে কেন?

'শুধু তিন মাস।'

'তারপর?'

'তারপর আমি যাব।'

'এসব অসুখের কোনো নিশ্চয়তা নেই, যখন-তখন আক্রমণ করে। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। কী-ই বা বয়স তোমার! একেই বলে দুর্ভাগ্য। চলি আজ।'

এরা সকলেই দৃষ্টি প্রসারিত করে গোপীমোহনকে বেরিয়ে যেতে দেখল। সতুর যেন মনে হল, এতদিন পর বাবার মেরুদণ্ডটা একটু নুইয়ে পড়েছে। হাইকোর্টের রায় শোনবার পরও তাঁর মনের অশান্তি দূর হয় নি।

হয়তো এখনো তিনি সত্যি সত্যি ভাবেন যে, সতু আর বান্টুরা এসে তাঁকে ঘেরাও করবে।

আজ ক'দিন থেকে পূর্ণ দাস রোডের বাড়িতে সতুর নামে একটা চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। চিঠি ঠিক নয়, মস্তবড় একটা মোটা খাম। গালা দিয়ে মুখ বন্ধ। খামটা দিয়ে গিয়েছিলেন দেবদাস মিত্র। কানাইয়ের হাতেই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সতুকে ছাড়া আর কাউকে দিও না। বাবুকে তো নয়ই।'

'চিঠিখানা সতুকে কে লিখেছেন?'

'গীতা—মানে আমার স্ত্রী।'

'তিনি তো নেই!'

'আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যা করবার আগেই লিখে রেখে গিয়েছিলেন। এতদিন এটা আমি দেখতে পাই নি। লুকনো ছিল। বোধহয় অনেকদিন থেকেই চিঠিখানা লিখেছিলেন—চিঠি ঠিক নয়, ছোটখাট একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস। পড়তে মজা লাগে।'

যখন বাড়িঘর সাফ হচ্ছিল তখন এটা বেরিয়ে পড়ল। একেবারে শেষ মুহূর্তে পাওয়া গেল। বাড়িটা বেচে দিয়েছি, কানাই।'

'এমন সুন্দর বাড়ি! বউমার কত পছন্দের বাড়ি ছিল ওটা, বেচলেন কেন?'

'একটা নতুন বাড়ি কিনেছি। আমার তো মাত্র আটত্রিশ বছর বয়স। নতুন করে ঘর-সংসার করতে হবে। নতুন বউ এসে যদি বলে, এখানে ভূত আছে তাহলে মুশকিলে পড়ে যাব। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা খুবই খারাপ। গড়িয়ার দিকে ছোট একটা বাড়ি কিনেছি কানাই।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল বাবু। ছাপোষা মানুষের মতোই বসবাস করা ভাল। বাঙালীদের বড় বড় বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, দামী দামী মেয়েছেলে—এসব নিয়ে—মানে—সতু এলে কি বলব?'

দেবদাস বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'গোল পার্কের বাড়িতে আমি আর আজ থেকে থাকব না। নতুন বাড়িওয়ালাকে দখল দিয়ে দিয়েছি। ঐ সম্পূর্ণ উপন্যাসখানা সতুর হাতে দিয়ে দিয়ো। গীতা বউদি সই করেন নি বটে, কিন্তু আমি জানি, ভাব আর ভাষা দুটোই তাঁর। কানাই, গোপীবাবু কি জানেন গীতা বউদি আত্মহত্যা করেছেন?'

'আমি তাঁকে বলেছিলাম। মৃত্যুর দিন আপনিই তো টেলিফোন করেছিলেন। সতু কিংবা বাবু কেউ বাড়ি ছিলেন না। আপনি বলেছিলেন, সুখবরটা তাঁদের দিয়ে দিও, কানাই। তাই আমি সেইদিনই খবর দিয়েছিলাম তাঁদের। ওঁরা দুজনেই খবর শুনে আঘাত পেয়েছিলেন।' দেবদাস মিত্রের পেছনে পেছনে কানাই বাইরের গেট পর্যন্ত চলে এল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বড় গাড়িটা কোথায় গেল? এই পুরনো ছোট গাড়িটা আগে কখনো দেখি নি।'

'ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এখন খুবই খারাপ—দুখানা গাড়িই

বেচে দিয়েছি। তোমাদের গীতা বউমা স্বর্গে দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু আমাকে ডুবিয়ে গিয়েছেন। একটা ছোট কারখানা করেছিলুম। লাখ তিন ঢালতে হয়েছিল। শৈশব অবস্থা কাটিয়ে উঠবার আগেই ঘেরাও আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ধাক্কা সামলাতে পারলাম না। বন্ধ করে দিতে হল। এখন তো জলের দামে বেচে দিতে চাই, কিন্তু খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। সরাসরি দানপত্র লিখে দিলে দু-একজন খদ্দের উৎসাহ দেখাচ্ছে।'

'যারা দুর্বল তারা আর করবেই বা কি। সতু বলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে এতবড় অস্ত্র আর কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি।'

'কোন্ অস্ত্র?'

'ঘেরাও অস্ত্র।'

নস্যির কৌঁড়ে থেকে বাঁ হাতের চেটোর ওপর খানিকটা নস্যি ঢেলে নিয়ে দেবদাস মিত্র বললেন, 'ঘেরাও-যুগ আমি পার হয়ে এসেছি, কানাই। গলা পর্যন্ত দেনা। নগদ কিছু নেই, শুধু এক লক্ষ টাকা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ভীষণ বিপদে না পড়লে ও টাকাটায় হাতে দেব না। কিন্তু হাত দিলেন তোমাদের গীতা বউমা। খুঁজে খুঁজে টাকাটা বার করেছিলেন তিনি। নিজের ব্যাঙ্কেও হাজার ত্রিশ ছিল। আত্মহত্যা করবার দুদিন আগে পুরো টাকাটাই চেক্ কেটে তুলে এনেছিলেন—' নাকের ফুটোতে নস্যি গুঁজতে লাগলেন দেবদাস মিত্র।

'টাকাগুলো গেল কোথায়? এক লাখ ত্রিশ হাজার! সঙ্গে তো আর নিতে পারেন নি।'

'তা হলে তো ভাবতুম স্বর্গে গিয়ে খরচ করতে পারবেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা একটা খামে ভর্তি করে সতুকে দিয়ে গিয়েছেন।

'অসম্ভব! সতুর কী সাংঘাতিক টানাটানি যাচ্ছে।'

'সতুর হাতে দেন নি—'

'দিলে সতু নিত না।'

'সেই জন্যই একটা খামে ভর্তি করে অন্য কারো জিম্মায় রেখে গিয়েছেন। সতুর কাছে থাকলে ফেরৎ পেতাম আমি। কিন্তু সম্পূর্ণ উপন্যাসটা পড়ে মনে হচ্ছে, আত্মহত্যা করবার ঘণ্টা দুই আগে তিনি গোপীবাবুর কাছে এসেছিলেন—'

'সর্ব্বনাশ করে গিয়েছেন বউমা! ও-টাকা আর বেরুবে না।'

'আমিও জানি, বেরুবে না। শুধু উপন্যাসের ইশারা-ইঙ্গিতের ওপর নির্ভর করে মামলা মোকদ্দমাও করা যায় না। দিশী বিদেশী অনেক উপন্যাসই আমি পড়েছি, কানাই। কিন্তু আত্মহত্যার পূর্বে একটি নির্দোষ ব্যবসায়ী-স্বামীকে এইভাবে ফতুর করে যাওয়ার কথা আমি কোথাও পড়ি নি। পড়লে সাবধান হতে পারতুম। এখন আর উপায় নেই। সব বেচে-টেচে দিয়ে কোনো রকমে গড়িয়ার দিকে সরে পড়তে পারলে আত্মসম্মান রক্ষা পায়।'

'আবার বিয়ে করছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ। একজন দালাল বহু দূরের একটা পল্লীগ্রামে পাত্রী খোঁজ করতে গিয়েছে।' গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করলেন দেবদাস মিত্র। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও স্টার্ট নিল না। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'কানাই, পেছন থেকে একটু ঠেলে দাও।'

'আমি কি পারব? আমি দুর্বল। হাইকোর্ট থেকে ঘেরাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে রায় বেরুবার পর দারোয়ানটাকে বাবু ছাড়িয়ে দিলেন। সে থাকলে আমরা দুজনে মিলে ঠেলে দিতে পারতাম।'

এই সময়ে পাশের গলি থেকে গুটি পাঁচেক ন-দশ বছরের ছেলে পেয়ারা চিবুতে চিবুতে গাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল। একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠেলব নাকি সার?'

'একটু হাত লাগাও ভাই।' অনুরোধ করলেন দেবদাস।

'কত দেবেন, দাদা? এ অঞ্চলে কুলী-টুলী পাওয়া যায় না। এটা বড়লোকদের পাড়া।'

দেবদাসের মনে হল, এরা বড়লোক আর ভদ্রলোকেরই ছেলে।

'কত চাই?'

'দেবেন, যা আপনার মন চায়।' পেয়ারাগুলো হাফ প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ওরা দেবদাস মিত্রের গাড়িটাকে ঠেলতে লাগল।

কানাই আর অপেক্ষা করল না, ভেতরে চলে এল। রান্নাঘরে গিয়ে খুন্তি ধরবার আগে ওর মনে হল, কী ভাগ্য নিয়েই না গোপীবাবু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট আর নেই। ভেঙে গিয়েছে। ঘেরাও আন্দোলনও বন্ধ। গোপীমোহন তবু দিনরাত্রি শুধু কেটে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। সতু নেই, বান্টুর সঙ্গে দেখা হয় না, পরিমল যে-কোনো দিন মরে যেতে পারে, সুনন্দারও ভবিষ্যৎ নেই, তা সত্ত্বেও গোপীমোহন ঘেরাও হয়ে বাস করছেন বলে ভাবেন।

ক'দিন থেকে বাড়িতেই বসে আছেন। কলকাতার পথে ঘাটে গণ্ডগোল।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এদিক ওদিক পুলিশের গুলি চলছে, বিক্ষোভকারীদের হাত থেকেও ইটপাটকেল আর সোডার বোতল নিক্ষেপ হচ্ছে। কোথাও কোথাও দু-একটা খণ্ডযুদ্ধও হচ্ছে। গণ্ডগোলটা কলকাতার এসপ্লানেড অঞ্চলেই বেশি। ক'দিন থেকে শুধু একটা জায়গাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। তার পাশের রাস্তাটা শান্ত। হোটেল রেস্তরাঁ খোলা রয়েছে। সেখানে লোকের কোনো অভাব নেই। বসে বসে খদ্দেররা চা আর চপ-কাটলেট খাচ্ছে। গুলির আওয়াজ শুনলে একটু চমকে উঠছে বটে, কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। খদ্দেরদের প্রত্যক্ষদর্শনের ইচ্ছে নেই। যারা প্রত্যক্ষ দর্শক তারা চা কিংবা চপ-কাটলেট খাচ্ছে না। বিশ হাত দূরেই এসপ্লানেডের মুখে দু-চার জন গণনেতা কিংবা দু-একজন

কবি আর লেখক একটু আগেই গ্রেপ্তার হলেন বটে, কিন্তু খদ্দেররা কেউ খবরগুলো জানতে পারল না। পরের দিন সংবাদপত্রে খবর আর ছবি ছাপা হবে। পরের দিনই খবরগুলো জানবে। কবি আর লেখকের ছবি দেখে চিনবে।

অতএব শহরের অবস্থা মোটামুটি শান্ত। গোপীমোহনের অস্বস্তি তবু কাটছে না। কেটে বেরুতে চাইছেন। ঘেরাও ঘেরাও মনোভাব। গত দুদিন থেকে আত্মসমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। জীবনটা এমন আনন্দহীন হয়ে উঠল কেন? দেশ এবং দশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক? লক্ষ লক্ষ ঘুষের টাকা রয়েছে। তার ওপর পেনসনের টাকা। সেটাও কিছু কম নয়। একটা মানুষের ভাল ভাবেই কেটে যেতে পারে। এত টাকা ঘুষ খাওয়ার দরকার কি ছিল? ছেলেরা কেউ তো তাঁর টাকায় হাত দিল না, দেবেও না। কিন্তু এই ধরণের পরিণতির কথা তিনিই বা জানবেন কি করে?

টাকা যখন থেকে আসতে আরম্ভ করল তখনই তাঁর মনোভাবটা বদলে গেল। বেশ কিছু জমে ওঠবার পর মমতাকে কুৎসিৎ মনে হতে লাগল। দেড় মণ দেহটাকে তিনি পৌণে তিন মণ বলে কল্পনা করতে লাগলেন। কোমরের চারদিকে ইঞ্চি দুই চর্বি ছিল। টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকেও তিনি প্রায় আট ইঞ্চি বলে লোকের কাঝে বলাবলি করতে লাগলেন। মমতাকে মেদ-মজ্জার মধ্যে কোনো আকর্ষণ নেই। পৌণে তিন মণের পাথর-খণ্ড কোনো কাজে লাগে না তাঁর। তিনি অসহায়, তিনি অকর্মণ্য হয়ে সময় নষ্ট করছেন। ব্যাঙ্কে আর সিন্দুকে যাঁর অতো টাকা, তাঁর পক্ষে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকা মহাপাপ।

দালালরা ঘেরাঘুরি করছিল। দু-এক জায়গায় যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। লেকের আশেপাশে, হোটেলের কামরায়, মফঃ-স্বলের ডাকবাংলোয় কাজ চালাতে লাগলেন। মমতা টের পেয়ে গেল। সত্যিকার স্ত্রী বলেই টের পেল। চোখে দেখবার দরকার

হল না। সেই কারণেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা সংসারের অন্যান্য সম্পর্ক থেকে একেবারে আলাদা। পরিমল বড় হয়েছে, সত্যপ্রকাশ খুব ছোট নেই। মমতা প্রতিবাদ করতে লাগল। সৎ ও সভ্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। গোপীমোহন শিক্ষিত মানুষ। সন্তান-দের কাছে সম্মান হারাতে চান না। মাথা তাঁকে উঁচু রেখে চলতে হবে। মমতার শাসন দৃঢ়তর হতে লাগল। অফিস থেকে সোজা বাড়ি না ফিরলে রেগে আগুন হয়ে যেত। অথচ সেই সময় আরো বেশি টাকা ঘুষের রথে চেপে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল। তিনি মমতার শাসন মানবেন কেন? যাঁর হাতে এতো টাকা তাঁর রাষ্ট্রের শাসনই বা মানবার দরকার কি? তিনি আরো অন্ততঃ পনেরো-ষোল বছর পুরুষ মানুষ থাকবেন। নিয়মিত পশু-প্রোটিন খেয়ে যাচ্ছেন। অনাচার কিংবা বাড়াবাড়ি করেন না। হাতে অতোগুলো টাকা এসে যাওয়ার পর স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তাঁর সতর্কতা বাড়ল। প্রথম জীবনেও স্বাস্থ্য ছিল, কিন্তু রক্ষা করবার জন্য তাঁকে সতর্ক হতে হয় নি। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য যে একটা রক্ষার জিনিস তাও তিনি জানতেন না। ভেবেছিলেন, দুটি ছেলেকে ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন। সাত-আটশ টাকা মাইনেতে চলে যাচ্ছিল। তা থেকে বালিগঞ্জে দু-তিন কাঠা জমিও তিনি কিনতে পারতেন। ক্রমে ক্রমে ছোটখাট একটা বাড়িও তুলে ফেলতে পারতেন। ছেলে দুটির বিয়ে দিতেন। নাতি-নাতনিদের নিয়ে বসবাস করলে মমতাকে কোনো দিনই পৌণে তিন মণ বলে মনে হতো না।

কিন্তু চেষ্টা করতে হল না, দুম্‌দাম্ করে ঘুষের টাকার বাণ্ডিলগুলো বিরুদ্ধপক্ষের চেষ্টাতেই তাঁর সামনে এসে ছিটকে পড়তে লাগল। তিনি কুড়িয়ে নিতে লাগলেন। একবার দুবার নেওয়ার পরেই নেশা ধরে গেল। কয়েকটা বছর বুঁদ হয়ে রইলেন। তারপর যখন চোখ খুললেন, তখন মমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পৌণে তিন মণ করে

তুলেছেন। কী সুন্দর মনস্তত্ত্ব! তারপরেই পা হড়কে বালিগঞ্জের হ্রদের জলে পড়ে গেল মমতা। পুলিস, পেয়াদা সকলেই গোপী-মোহনের দিকে। সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁকেই তোয়াজ করে। সমর্থন করে। এমন কি মুড়ি ভাজা বিক্রি করতে এসে যে ছেলেটি তাঁকে ধাক্কা মারতে দেখেছিল সে-ও চলে গেল তাঁর দিকে। পকেটে করে টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন গোপীমোহন। ছেলেটি যা পেল তা দিকে গ্রামাঞ্চলে সেও একটা কুটীর তৈরি করতে পারে।

এত কাণ্ডের পরও গোপীমোহন অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর হিসেবের খাতায় ভুল হয়ে গিয়েছে। অতো বড় বংশের ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন। ভেবেছিলেন, উত্তর পুরুষ নামটাও গর্বে বহন করে চলবে। হাসিশহরের সিংহ পরিবার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

এখন দেখছেন, পরিচয় বহন করার মতো শুধু একটি ঝাণ্ডাই উড়ছে এবং সেটাও লাল ঝাণ্ডা। ওয়াক থুঃ! ওয়াক থুঃ। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে থুথু ফেললেন গোপীবাবু।

বংশটা লোপ পাচ্ছে। সতুকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। প্রকৃতপক্ষে সতুই হচ্ছে ভবিষ্যতের বর্বর। ভবিষ্যতের পার্টিম্যান। সতু নিজে জানে না বটে, কিন্তু গোপীমোহন জানেন, সতুকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে একটা নতুন পার্টির জন্ম হচ্ছে। তাঁর যদি সাধ্য থাকত তা হলে সতু আর বান্টু দুটোকেই সাবাড় করে দিতেন। ওদের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের পরিচয় ফেলে দিতে চান না। কথাটা ভাবলেই কেমন যেন গা গুলোয় তাঁর।

আজ ক'দিন থেকে সত্যি সত্যি চব্বিশ ঘণ্টাই গা গুলোচ্ছে।

বাড়ির দক্ষিণ দিকটা খোলা। হু হু করে হাওয়া আসে। হাওয়া আসে লেকের দিক থেকে। যাঁরা মাটি কেটে হ্রদটা তৈরি করে গিয়েছিল তাঁদের প্রতি গোপীমোহন কৃতজ্ঞ। পুরো অঞ্চলটা জঙ্গলে ভর্তি ছিল। কয়েক ঘর গয়লা বাস করত এখানে। গোটা কয়েক খাটাল ছিল তাদের। কলা বাগান আর শাক-সব্জির

খেতও ছিল। তারপর সাহেবরা ভেবেচিন্তে হ্রদ কাটলেন এখানে। সাঁতার কাটবার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। নানারকম আমোদ-আহ্লাদের কেন্দ্র হয়ে উঠল এই লেক-অঞ্চল। ক্রমে ক্রমে জমির দাম বাড়তে লাগল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে এই পুরনো বাড়িটা কিনে রেখেছিলেন গোপীমোহন। তখন আশপাশের জমিগুলোও খালি পড়ে ছিল। তারপর গত কয়েক বছরের মধ্যে নতুন বাড়ি উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে ভরাট হয়ে গেল সব।

শুধু গোপীমোহনের বাড়ির সামনে রাস্তা পারিয়ে দক্ষিণ দিকে এক ফালি জমি এখনো খালি পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো মধ্যবিত্ত বাঙালী কিনে রেখেছেন। তিন কাঠার চেয়ে বেশি নয়। বোধ হয় জমিটুকু কিনতেই ফতুর হয়ে গিয়েছেন। বাড়ি তোলবার পয়সা জোগাড় করে উঠতে পারছেন না। এই ব্যাপারেও গোপী-মোহনের ভাগ্য খুব ভাল। জমির মালিকের হাতে পয়সা থাকলে সাত আটতলা একটা ম্যানশন তুলে ফেলতেন তিনি। গোপীমোহনের বাড়ির সামনে রাস্তা থাকলেও হাওয়া চলাচলে বাধার সৃষ্টি হতো। কিন্তু এতদিন যখন খালি পড়ে রয়েছে তখন মালিকের হাতে পয়সা নেই।

জানালার ওপর ভর দিয়ে দক্ষিণ দিকে চেয়েছিলেন তিনি। একসময়ে ঐ তিন কাঠা জমিটুকুও কিনে ফেলবেন বলে ভেবে-ছিলেন। এই বাজারে ষাট হাজার টাকা দাম হবে। বাড়ির সামনে অন্য কাউকে তিনি মাথা খাড়া করবার অধিকার দিতে চান নি। দরকার হলে এক লক্ষ টাকা দাম দিয়েও কিনে ফেলতেন।

কিন্তু এখন আর সেসব চিন্তা মাথায় ঢোকে না তাঁর। বাড়ি আর জমির প্রতি মমতা নেই। লুকনো টাকাগুলোও বোঝার মত মনে হচ্ছে। সন্তান দুটি অমানুষ হবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

আরো একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন গোপীমোহন। খালি জমিটার পাশে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। কয়েকজন লোক নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। জমিটা যেন এতদিন একটা মৃতদেহের মতো পড়ে ছিল ওখানে। আজ বোধ হয় আবার প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে। ফিতে দিয়ে মেপে দেখছে জমি। এবার বাড়ি তৈরি হবে ওখানে। ম্যানশন উঠবে। মনে মনে খুশী হলেন গোপীবাবু। আগের মতো আর হু হু করে হাওয়া ঢুকবে না এখানে। তাঁর মৃত্যুর পর সতু আর এখানে দেহ এলিয়ে দিয়ে আরাম করে নাক দিয়ে নির্মল হাওয়া টানতে পারবে না। লেকের হাওয়ায় ধুলোবালি কম।

মনে মনে হাসতে লাগলেন গোপীমোহন। তিনি না মরলে সতু এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। জ্যোতিষ সম্রাটের গণনা থেকে দশ বছর বাদ দিলেও নব্বই বছর বাঁচবেন তিনি। সতু ততদিন বুড়ো হয়ে যাবে। পিতার সম্পত্তি ভোগ করার আগে সে হয়তো মরেও যেতে পারে। জ্যোতিষ সম্রাটকে দিকে দিয়ে সতুর কোষ্ঠীবিচার করবেন বলে ঠিক করলেন তিনি।

তিন কাঠা জমি মাপ হচ্ছে। সঙ্গে একজন ইঞ্জিনীয়ার এসেছেন। মালিক কেউ এসেছেন বলে মনে হল না তাঁর। খাকী হাফ-প্যাণ্ট পরে ইঞ্জিনীয়ারটি নকশাটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। জানালায় দাঁড়িয়ে গোপীবাবু বুঝতে পারলেন না ম্যানশনটা কতটা উঁচু হবে।

মনটা কেমন উদাস হয়ে এল গোপীবাবুর। সময় কাটাবার মতো হাতে কোনো কাজ নেই। সংসারটা ফাঁকা। ইচ্ছে করলে গোটা কয়েক বাড়ি তিনি তৈরি করতে পারতেন। ভাড়া দিয়ে দিতেন সেগুলো। অনেক টাকা ভাড়া আসত। ছেলেপেলে আর নাতি-নাতনিরা পরম সুখে কালাতিপাত করতে পারত। তাঁর ঘুষ খাওয়ার মূলে এই ধরণেরই একটা কল্পনা ছিল। যারা ঘুষ খায় তাদের সকলের মনেই এই ধরণের আকাংখা থাকে। সেই

জন্যই সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করে এরা। গোপীমোহন মনে মনে খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এত টাকার দরকার ছিল না তাঁর। সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ না করলেও সুখে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে যেতে পারতেন। এখন এইসব বিষয়সম্পত্তি আর টাকা পয়সা দিয়ে কি করবেন তিনি?

হাফ-প্যান্ট পরে ইঞ্জিনীয়ারটি জমি মাপছেন। অন্য দু'জন লোক জমির এক পাশে দুটো বাঁশ পুঁতে দিয়ে একটা সাইনবোর্ড টাঙালো। গোপীবাবু সাইনবোর্ডের লেখাগুলো পড়লেন। তাঁর দোতলার দিকে মুখ করেই সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে দিল ওরা। গৃহ নির্মাণের ঠিকেদার সেন অ্যাণ্ড সেন কোম্পানির ঠিকানা লেখা রয়েছে ওতে। কোম্পানিটা বড় বলেই মনে হল গোপীবাবুর। বালিগঞ্জের আরো গোটা কয়েক রাস্তায় এই সাইনবোর্ডটা তিনি দেখেছেন। একসঙ্গে অনেকগুলি বাড়ি তৈরি করছে এরা। গোপীমোহনের বাড়ির দিকে সাইনবোর্ডটা টাঙাবার অর্থ কি? এই ধরণের একটা পুরনো বাড়িকে বোধহয় ঠাট্টা করছে ঠিকদাররা। বাড়িওয়ালাদের স্বর্ণযুগ চলেছে। কংগ্রেসী রাজত্বে কলকাতার বাড়িওয়ালাদেরই আয় বেড়েছে সকলের চেয়ে বেশি। চারটে দেয়াল খাড়া করে একটা ছাদ ফেলে দিতে পারলেই প্রচুর পরিমাণে ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়াটেদের সুবিধা অসুবিধার কথা না ভাবলেও চলে। কংগ্রেসী রাজত্বের নতুন ইতিহাসে কলকাতার বাড়িওয়ালারাই হচ্ছে সত্যিকারের হিরো।

দুপুরের দিকে বত্রিশ সনের ফোর্ড গাড়িতে চেপে হাওয়া খেতে চললেন গোপীমোহন। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে ছিল কানাই। বলল সে, 'একটা কথা ছিল, বাবু—'

'কি কথা?' নড়বড়ে কাঠের রেলিংটার ওপর হাত রাখতে গিয়েছিলেন গোপীবাবু। একটু চাপ পড়তেই রেলিং-এর একটা টুকরো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

মৃদু হেসে গোপীমোহন বললেন, 'আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।'

'আজকে নয়, বহু বছর আগে।' কানাই আজ কড়া কথা বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল।

'কথাটা এবার বলে ফেল—'

'আমায় ছুটি দিয়ে দাও।'

'কেন?'

'দেশে যাব। এখানে আর মন বসছে না। ফাঁকা বাড়ি। ছেড়ে দাও আমায়।'

'দেশে গিয়েও তো চুপ করে বসে থাকতে হবে।'

'সেখানে লোকজন আছে।—পরিমল গেল, এখন তো দেখছি সতুকেও তাড়িয়ে দিলে। তোমার বাড়িটাকে আজকাল পাড়ার লোকেরা ভুতুড়ে বাড়ি বলে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাও বলে ওখানে ঢুকিস নি, ভূত আছে। কাল রাত্রে আমি নিজেও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বাবু।'

বাইরে বেরিয়ে এসে গোপীমোহন বললেন, 'যুক্তফ্রন্ট উঠে গেল, এরপর আবার ভয় কিসের?'

'ভূতের। গতকাল মাঝরাত্রিতে একতলার স্নানঘরে হঠাৎ কল থেকে হড়-হড় করে জল পড়তে লাগল—দেখতে দেখতে স্নানঘরটায় প্রায় কোমর পর্যন্ত জল জমে উঠল। কলটা আমি টাইট করে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও জল পড়তে লাগল। আধঘণ্টার মধ্যেই ওখানে সৃষ্টি হল একটা হ্রদ। দরজাটা বন্ধ করতে গেলাম, পারলাম না। কে যেন ভেতর থেকে টেনে ধরল। ভয়ে আমি তখন ঠক্-ঠক্ করতে কাঁপতে লাগলাম।'

'আমি কি করছিলাম?'

'অচৈতন্য হয়ে ঘুমচ্ছিলে। রাত দুটো—তোমাকে কত ডাকলাম—দরজা বন্ধ করে ঘুমচ্ছিলে—বাপ্ রে, সে কী ঘুম!'

'ঘুমের আর দোষ কি বল্? পুরো একটি বোতল স্কচ কাল সাবাড় করে বাড়ি ফিরেছিলাম।'

'বাবু, এ তো এক বোতলের ঘুম নয়। দুম্‌দাম্‌ করে দরজায় লাথিও মেরেছিলাম—'

'তা হলে বোধহয় ঘুমের মধ্যেও স্কচ পান করছিলাম। বড় ভাল জিনিস রে, কানাই। তারপর কি হল বল্‌—'

স্নান ঘরের ভেতর থেকে তিনি বললেন ; 'এবার আমি সাঁতার শিখেছি—'

'কে বললেন ?'

'মা। দাঁড়াও বাবু—'

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করলেন গোপীমোহন। কানাইয়ের কথায় আর কান দিলেন না। দুপুরবেলা বেড়াতে বেরুচ্ছেন তিনি। ভূতের গল্প শোনার সময় নেই তাঁর।

খালি জমিটার পাশে গাড়িটা দাঁড় করালেন গোপীমোহন। সাইনবোর্ডের লেখাগুলো ভাল করে পড়লেন। ইঞ্জিনীয়ারটি গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, নমস্কার সার। আমাদের কোম্পানির মালিক মিস্টার সেন আজ সকালেই আপনার কথা বলছিলেন —'

'আমাকে তিনি চেনেন নাকি ?'

'না, আপনার বাড়িটা তিনি চেনেন। বালিগঞ্জের কোথাও এতো পুরনো বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় না—তাছাড়া এতোটা জমি খালি পড়ে রয়েছে—'

'খালি পড়ে রয়েছে কে বলল ? দেখছেন না আম, জাম, কাঁঠাল, সবেদা আর পেয়ারা গাছ রয়েছে ?'

'ওসব ফলের গাছ পোঁতবার জন্য কলকাতার মাটি ভগবান সৃষ্টি করেন নি। কলকাতার মাটি হচ্ছে গিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির জন্য।'

'কে বলল ?'

'জোব চার্নক—' হাসতে হাসতে ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি বললেন, 'মিস্টার সেন নিজেই ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করে দেন। মানে, ধরুন আপনার যদি পুঁজির অভাব থাকে তা হলে সেন কোম্পানী

ফাইনান্স করে এবং আস্তে আস্তে ভাড়াটেদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেয়। অবিশ্যি সম্পত্তির মালিকানা আপনারই থাকবে।'

'বুঝেছি। এখানে ক'তালা বাড়ি উঠছে?'

'দোতলা। তবে ভিৎ গাড়া হচ্ছে দশতলার জন্য। জমির মালিক ব্যবসা করেন। আগে চানাচুর ভাজা বিক্রি করতেন। যুবকটি যে একদিন খুবই উন্নতি করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

গোপীমোহন গাড়ির গীয়ার টানলেন। ইঞ্জিনীয়ারটি তাড়াতাড়ি কয়েক পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মালিকদের বলব না কি সার?'

'কি সম্বন্ধে?'

'আপনার পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলে তাঁরা নতুন বাড়ি তৈরি করে দিতে পারেন। প্ল্যান তৈরি করব আমি। দেখবেন, কী সুন্দর প্ল্যান। আপনি চমৎকৃত হয়ে যাবেন। চমৎকৃত হবেন এ-পাড়ার বাসিন্দারা। সুন্দর জিনিস কার না ভাল লাগে বলুন? একতলা, দোতলা ভাড়া দেবেন—কোম্পানী লীজ। ব্যবস্থা করে দেব আমরাই। আগাম ভাড়াও পাইয়ে দেব আমরা। চাপা দেবেন না, সার। একটু দাঁড়ান। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য মিষ্টার সেন আমায় অনুরোধ করেছিলেন।'

'কি উদ্দেশ্যে?'

'পূর্ণদাস রোড থেকে এই দগদগে ঘা-টা রিমুভ করবার উদ্দেশ্যে। সত্যিই আপনার বাড়িটা একটা দগদগে ঘায়ের মতো দেখায়। আমার কথায় বিশ্বাস না করেন, পাড়ার লোকদের জিজ্ঞেস করবেন, সার।'

রাগ করলেন না গোপীমোহন। মৃদু হেসে বললেন, 'সেন অ্যাণ্ড সেন কোম্পানির ঠিকানাটা আমার জানা আছে। আমার

বেড-রুমের দিকে মুখ করে সাইনবোর্ডটা টাঙিয়েছেন। আমার চোখের সামনে ঝুলে থাকবে ওটা। নমস্কার—'

ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি ছাড়বার পাত্র নন। পাশে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ মশাই, আপনার বাড়িতে নাকি ভূত আছে? মেয়ে ভূত?

'আছে।'

'আপনি দেখেছেন?'

'না। আমার চাকর দেখেছে।'

'ভয় করে না আপনার? যদি ঘাড় মটকে দেয়?'

'পারবে না। ভূতের নিজের দেহের ওজন তিন মণ। নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। সরে দাঁড়ান এবার—'

'আমার মনে হয় নতুন নতুন ফ্ল্যাট তৈরি করলে আপনার এলাকায় আর ভূতটুত প্রবেশ করতে পারবে না। কাল আমি মিষ্টার সেনকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। তিনিই ফাইনান্স করে গোটা ত্রিশ ফ্ল্যাট তৈরি করে দিতে পারবেন। টাকা শোধ করবে আপনার ভাড়াটেরা। আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।'

'তার মানে?'

'গোঁফে তা দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। ঐ ভদ্রলোকটি আসছেন—নতুন মডেলের গাড়ি কিনেছেন গতকাল। দাঁড়ান, আলাপ করিয়ে দিই। তিন কাঠার ওপর এখন দোতলা তুলছেন—পরে আরো আটতলা তুলবেন। লেখবার মতো জীবনী, মশাই। প্রথম জীবনে লেকের ধারে ঘুরে ঘুরে চানাচুর বিক্রি করতেন—কে জানে গুল্ মারছেন কিনা। দাঁড়ান—'

গোপীমোহন দাঁড়ালেন না। গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে এলেন পূর্ণদাস রোড থেকে। প্রথমে এলেন হ্রদের দিকটায়। বহুদিন এই দিকে আসেন নি তিনি। হিসেব করে দেখলেন মমতার মৃত্যুর পর আজকেই তাঁর প্রথম আগমন।

কোনো কিছুই বদলায় নি। হ্রদের জল ঠিক আগের মতোই আছে। আশপাশে জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী বসে বসে গল্প করছে। দু-চারজন মুড়ি আর চানাচুর বিক্রেতাকেও দেখলেন তিনি। এদিক-ওদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগলেন। সেই ছেলেটি নিশ্চয়ই এখন আর মুড়ি-ভাজা বিক্রি করতে আসে না। হয়তো টাকা পেয়ে সে ব্যবসা করতে শুরু করেছিল। কে জানে, এতদিনে সে হয়তো লক্ষপতি হয়েছে। লোকে বলে, পাপের টাকায় কোনো কিছুই হওয়া যায় না। মমতাকে যে তিনি ধাক্কা দিয়ে লেকের জলে ফেলে দিয়েছিলেন তার সাক্ষী ছিল শুধু সেই ছেলেটিই। ধাক্কা দিতে সে স্বচক্ষে দেখেছিল। তারপর পুরো পাস টাই তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেটিকে। কতটাকা ওতে ছিল এখন আর তা মনে নেই। তবে হাজার দু-তিন নিশ্চয়ই ছিল। একটা গাছতলায় গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে গোপীমোহন জলের ধারে পায়চারি করতে লাগলেন।

মাঝে মাঝে মমতার ছবিটা যেন ভেসে উঠতে লাগল জলের ওপর। হ্রদের দিকেও শান্তি নেই। মমতা-সিলিংটা মাথার উপরে ঝুলছে। কেটে বেরিয়ে যেতে হবে। ইতিহাসের পাতায় সিংহ পরিবারটা চিহ্নহীন হয়ে যাক। লোপ পেয়ে যাক গোপীমোহনের পরিচয়।

নতুন একটা গাড়ি এসে থামল ওখানে। বত্রিশ সনের ফোর্ড গাড়িটার পাশে এই বছরের তৈরি গাড়িটাকে যেন একটা সদ্যজাত শিশুর মতো দেখাচ্ছিল। সুস্থ সবল আর সুন্দর একটি শিশু। গোপীবাবু ভাবলেন, এটা যদি পরিমলের ছেলে হতো? কিংবা সতুর? তা হলে আর সমস্যা থাকত না। ঘুষের টাকাগুলো বহন করতে অস্বস্তি বোধ করতেন না তিনি। কিন্তু তা আর হল কই? বিষয়সম্পত্তি আর টাকা পয়সা সব একদিন তো ফেলে যেতে হবেই। উড়িয়ে দেওয়ারও সুযোগ নেই। এই বয়সে আমোদ আহ্লাদের

সুযোগ বড় সীমিত। মরবার আগে সবই দান করে যেতে হবে। মিশনের লোকেরা মাঝখানে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের খবর শুনে তাঁরা নিরাশ হয়ে আর এদিকে আসেন নি। গোপীমোহন জানেন, তাঁর মাথার ওপর দিয়ে যখন শকুন উড়তে আরম্ভ করবে তখন বিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হয়ে আসবে।

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন গোপীমোহন। গাড়ী থেকে একটি যুবক নেমে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। গত দশ-বারো বছরের মধ্যে কেউ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছে বলে মনে করতে পারলেন না তিনি। অবাক হয়ে যুবকটির দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

যুবকটি বলল, 'আমার নাম উমাপ্রসাদ বসু।'

'চিনতে পারলাম না।'

'একদিনই শুধু দেখেছিলেন আমায়। তাও অন্ধকারে। দেখেছিলেন ঠিক এই জায়গায়'—

'ও, বুঝেছি। মুড়ি-ভাজা বিক্রি করতে এসেছিলে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পূর্ববঙ্গের রিফিউজী। রাত্রিবেলা মুড়ি-ভাজা বিক্রি করতাম।' থেমে গেল উমাপ্রসাদ।

'দিনের বেলা কি করতে?'

'স্কুলে পড়তাম।'

'এম-এ পাস করলে বুঝি?'

'না। দরকার হল না। সময় নষ্ট করতে বারণ করলেন আমার বিধবা মা। বললেন, পয়সা নষ্ট করে এম-এ পড়বার দরকার নেই।'

'এম-এ পাশের বদলে কি করলে?'

'ব্যবসা করতে আরম্ভ করলাম। আপনি যে টাকাটা দিয়েছিলেন সেটা লগ্নী করলাম ব্যবসায়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা একটা পয়সাও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন নি। এখন

একটা কারখানা চালাচ্ছি। অফিস চালান মা। আমি বাইরে ঘুরে ঘুরে অর্ডারপত্র নিয়ে আসি।'

'আমার টাকাটা কাজে লেগেছে বলো?'

'খুব। এখন মানুষের মতো জীবনধারণ করছি। দুটি ছেলে আছে আমার। দুটিকেই পার্ক স্ট্রীটের সাহেবদের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।'

'পাপের টাকাতেও মানুষ তা হলে বড় হতে পারে।'

'আমি তো পাপ করিনি—'

'অংশ নিয়েছ। তোমার তো উচিত ছিল পুলিশকে খবর দেওয়া। আমাকে ধরিয়ে দিলেই পুণ্য করা হতো। যাক গে। আমাকে চিনলে কি করে?'

'এই গাড়িটাকে দেখে। আপনার বাড়ির সামনে অনেকদিন আগে তিন কাঠা জমি কিনে রেখেছিলাম। এবার বাড়ি তৈরী করব। আপনাকে দেখলাম ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তারপর পিছু ধরলাম আপনার। আমি কৃতজ্ঞ।'

'কেন?' জলের ধার থেকে ওপরে উঠে এলেন গোপীবাবু।

'আপনার কাছ থেকে পুঁজি না পেলে সারা জীবন হয়তো মুড়ি-ভাজা বিক্রি করতে হতো। এখন আপনার প্রতিবেশী হয়ে বাস করব।'

'আমি বোধহয় ওখানে আর থাকব না—'

'কেন?'

'বিষয় সম্পত্তি সব সাধু সন্ন্যাসীদের দান করে দেব।'

'কেন, আপনার ছেলেপেলে নেই?'

'থেকেও নেই। একজন কমিউনিস্ট, অন্যজন কবি।'

'তা হোক না। আমাদের দেশে কি বাড়িওয়ালা কমিউনিস্ট আর বাড়িওয়ালা কবি নেই?'

হ্যাণ্ডেল মেরে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন গোপীমোহন। উমাপ্রসাদ

কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন তা হলে একটা কথা আপনাকে বলতে চাই।'

'বলো।' গাড়িতে উঠে বললেন গোপীমোহন।

'সেই টাকাটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাই।'

'কেন ?'

'পাপের টাকাটা ঘরে রাখতে চাই না। সাধুসন্ন্যাসীদের দান করে দেবেন।' পকেটে হাত ঢোকালো উমাপ্রসাদ।

গোপীমোহন লক্ষ্য করলেন না। গীয়ার টেনে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন পশ্চিম দিকে।

গতকাল রাত করে বস্তিতে ফিরে এসেছিল সতু। ঘেরাও-আন্দোলন দেখবার জন্য সে নৈহাটি গিয়েছিল। নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে। বড় বড় দু'চারটে কারখানার ফটকে গিয়ে খবর নিয়ে এল যে, হাইকোর্টের রায় বেরুবার পর শ্রমিকরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। ঘেরাও-অস্ত্র ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কলকাতায় ফিরে এসে সত্যপ্রকাশ সন্ধ্যাবেলা পূর্ণদাস রোডেও গিয়েছিল। ফটকে দারওয়ান নেই। ঘেরাও আন্দোলন বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর বাবা বোধহয় দারওয়ানটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অনাবশ্যক টাকা নষ্ট করবার মানুষ তিনি নন।

বাইরে থেকে বাড়িটাকে ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে হচ্ছিল। কলকাতার সর্বত্রই আলো জ্বলেছে, জ্বলেনি শুধু বাবার বাড়িতে। সত্যপ্রকাশ দরজার কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলার নিয়ম নেই। দরজার ফুটো দিয়ে কানাই আগে লোকটিকে দেখবে, তারপর লোকটি যদি চেনা হয় তা হলে দরজা খুলবে। আজো নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হল না। দরজার মাথায় একটা আলো আছে। ভেতর থেকে সুইচ টিপে কানাই আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে দরজার ফুটো দিয়ে সতুকে দেখে নিল একবার।

সতু জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা বাড়ি নেই, কানাইদা?'

'না। এই সময় তিনি কোনোদিনই বাড়ি থাকেন না। যুক্ত-ফ্রন্টের আমলে শুধু কয়েকটা মাস বাইরে বেরোন নি। এখন যুক্ত-ফ্রন্ট তো উঠে গেল—আবার আগের মতো অনেক রাত করে বাড়ি ফেরেন তিনি। তুমি আর ক'দিন থাকবে পণ্ডিতিয়া রোডে?'

'দাদার বুকের ব্যারামটা আবার বেড়েছে। পয়সার অভাবে ঠিক মতো ওষুধপত্র খেতে পারছে না। ইস্কুল যাওয়ারও ক্ষমতা নেই।'

'তা হলে সংসার চলবে কি করে?'

'তাঁর জায়গায় আমি কাজ করব।'

অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে কানাই বলল, 'চাকরি করবার লোক নও তুমি। বাবু তো একবার করপোরেশনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ক'দিন কাজ করেছিলে?'

সত্যপ্রকাশ হাসতে হাসতে বলল, 'সাতদিন।'

এক বছর আগের কথা। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সত্যপ্রকাশ। তারপর গোপীমোহন ওকে একদিন গাড়ি করে করপোরেশনের অফিসে নিয়ে এসেছিলেন। গাড়ি থেকে নামবার আগে গোপীমোহন বলেছিলেন, 'এই অ্যাপ্লিকেশনটা সই করে দে। ভেতর থেকে আমি সব ঠিক করে রেখেছি। চাকরি তোর হবেই।'

'কি চাকরি?'

'বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের কেরানীর চাকরি। মাইনে যদিও শ-দুই টাকা, কিন্তু ঘুষ নেওয়ার সুযোগ আছে অনেক। নেওয়ার কায়দা-কানুন আমি সব শিখিয়ে দেব। এই চাকরির জন্য দু-একজন মন্ত্রীর বি-এ ফেল ছেলেরাও চেষ্টা করছে। তুই তো ফেল করিস নি, পড়তে পড়তে পালিয়ে এলি। নে, সই করে দে।'

'সই করছি, কিন্তু চাকরিটা আমি গ্রহণ করব কি না সে সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না।'

কানাইকে গল্পটা বলছিল সত্যপ্রকাশ। আগে সে গল্পটা বলবার সুযোগ কখনো পায়নি। কানাইদা হয়তো ওকে একটি অকর্মণ্য ভবঘুরে বলে ভাবে।

চাকরিটা নিয়েছিল সত্যপ্রকাশ। প্রথম দিন থেকেই কেরানী-বাবুরা বুঝতে পারছিলেন যে, একে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। ছোকরাটি ঘুষ খাওয়ার উপযুক্ত নয়। উপরন্তু অন্য কেউ ঘুষ নিলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় সে। এই ধরনের একটি অদ্ভুত চীজ গত একশো বছরের মধ্যে বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করে নি।

সেই জন্য ওকে কোনো কাজ দেওয়া হল না। টেবিলে ফাইল আসে না একটিও। অফিসে গিয়ে চেয়ারে বসে শুধু বই পড়তে লাগল। ওর টেবিলটা ফাঁকা থাকে বলে সেটা অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছিল। দর্শনপ্রার্থীদের বসবার জন্য আলাদা চেয়ার কিংবা বেঞ্চি নেই। তাঁরা এসে টেবিলের ওপর বসে মাটিতে পা ঠেকিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। ইচ্ছে করেই কেরানীবাবুরা এঁদের অপেক্ষা করিয়ে বসিয়ে রাখেন।

বেলা তিনটের সময় একটা চা-ওয়ালা একগাদা পেয়ালা এনে ফেলে রাখে ওর টেবিলের ওপর। এই ধরনের কুৎসিত পেয়ালা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তৈরি হয় না। তৈরি করবার চেষ্টা করলে গভর্ণমেণ্ট আইন করে বন্ধ করে দিতে।

সত্যপ্রকাশ দেখত, বিরাট বড় একটা কেটলী থেকে চা ঢেলে ঢেলে পেয়ালাগুলো ভর্তি করছে চা-ওয়ালা। তারপর দু-হাতে দুটো করে পেয়ালা তুলে নিয়ে বাবুদের সামনে রেখে দিয়ে আসত শুধু এই ঘরের নয়, অন্য ঘরের বাবুদেরও চা পরিবেশন করত সে। সত্যপ্রকাশ জানত না যে, চায়ের দাম দিত বাইরের দর্শনপ্রার্থী।

'বুঝলে কানাইদা, আমি ঘুষ খাই না বলে ওরা আমায় একঘরে করে রেখেছিল। শেষ দিনের ব্যাপারটা ভারী মজার। তারপর আর যাই নি। সাত দিনের মাইনে পড়ে রয়েছে করপোরেশনের অফিসে। বাবা গিয়ে তুলে এনেছিলেন কি না জানি না।'

হাসতে হাসতে গল্প বলতে লাগল সতু। সেদিনও বেলা তিনটের সময় গোটা ত্রিশ চায়ের পেয়ালা সতুর টেবিলের ওপর জড়ো করে রাখল চা-ওয়ালা। গায়ের ওপর চা ফেলে দিতে পারে ভেবে সত্যপ্রকাশ টেবিল থেকে একটু দূরে সরে বসে বই পড়ছিল।

হঠাৎ ওর বই পড়ার তন্ময়তা ভেঙে গেল। জন কয়েক বৃদ্ধ কেরানী চায়ের পেয়ালাগুলো হাতে করে নিয়ে এসে চা-ওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়ালেন। রমেশবাবু তেড়ে উঠে বললেন, এসব হচ্ছে কি, যতীন? এক কাপের দাম নিয়ে হাফ কাপ চা দিচ্ছিস?

বিপুল মুখুজ্জে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, 'আমাদের কর-পোরেশনের অপিসে ঢুকে জোচ্চারি করা হচ্ছে?'

তিলক দত্ত যতীনের ঘাড়ের কাছে হাতটা এগিয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'ঘাড় মটকে দেব, জুয়াচোর কাঁহাকার। এখানে আর ঢুকতে দেব না। এটা চোর-জোচ্চরদের অফিস নয়, যতীন। এতদিন ধরে কিছু বলিনি বলে ভাবছিস কোনোদিনই কিছু বলব না? চোর, থিপ্—বিপুলদা। অ্যানটি-করাপশন ডিপার্টমেন্টের লোকদের টেলিফোন করে দিন। হাতেনাতে ধরিয়ে দিন। এক পেয়ালা চায়ের পুরো দাম নিয়ে হাফ কাপ দেওয়া হচ্ছে!'

যতীন কেটলী হাতে নিয়ে নির্বিকার ভাবে গালাগালি শুনে যাচ্ছিল। তারপর যখন তিলক দত্ত সত্যি সত্যি ওর ঘাড়ে হাত দিতে যাচ্ছিলেন তখন যতীন বলে উঠল, 'আপনারা তো দাম দেন না, দাম দেয় বাইরের লোক। ফোকোটে চা খাচ্ছেন—'

'বটে! শুনলেন রমেশদা? ব্যাটার আসপদ্দার কথা শুনলেন? বাইরের লোক টাকা কি তোর মুখ দেখে দেয় রে হারামজাদা?

আমরা তাড়াতাড়ি তাদের কাজ করে দিই বলেই তো তারা আমাদের চা খাওয়ায়। কাজের বদলে চা—আর চায়ের বদলে টাকা। তা হলে টাকার সোর্স কোথায়? ফন্দিটা ওকে বুঝিয়ে দিন।'

'টাকার সোর্স হচ্ছে ফাইলে আর ফাইল ক্লীয়ার করি আমরা, বিপুল মুখুজ্জে ইতিমধ্যে চুমুক মেরে মেরে চা-টুকু শেষ করে ফেলেছিলেন। এবার তিনি ছোকরার হাত থেকে কেটলীটা টেনে নিয়ে দ্বিতীয়বার নিজের পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বললেন, ব্যাটা মূলের খবর রাখিস না, আবার তক্ক করে যাচ্ছিস? শুধুশুধি কেউ আমাদের চা খাওয়ায় না। এটার নাম হচ্ছে বিল্ডিং ডিপার্ট-মেণ্ট।'

'তাই বলে হড়হড় করে চা ঢেলে পেয়ালা ভর্তি করে নেবেন না কি? আধ পেয়ালার জায়গায় পুরো এক পেয়ালা নিলেন কেন?'

'আলবৎ নেব।' এবার তিলক দত্ত ঢালতে লাগলেন।

'একশোবার নেব'—রমেশবাবু থাবা মেরে তিলক দত্তর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন কেটলীটা। সত্যপ্রকাশ দেখল, সোর্সট শুকিয়ে গিয়েছে। কেটলীতে আর এক ফোঁটাও চা নেই। অন্য কারো ভাগ্যে আর চা জুটবে না।

যতীন হতাশ হয়ে বলল, 'আমি ত্রিশ পেয়ালার দাম পেয়ে গিয়েছি। আপনারা ক'জনে মিলে সব শেষ করে দিলেন। এখনে অ্যাসেসমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের বাবুরা বাকী রয়েছেন।'

কোণার দিকে একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষ করছিলেন। উনি যে সকাল থেকে এসে বসে রয়েছেন সত্যপ্রকাশ তা বুঝতে পারে নি। তিনি এবার যতীনের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'বাদ পড়লে তো ভাই কাজ চলবে না। সকলকে চ খাওয়াতে হবে—অনেকদিন থেকে খাওয়াচ্ছি। এঁরা সবাই

শেকলের মতো বাঁধা রয়েছেন। এঁদের হাত দিয়ে ফাইল চলাচল করে। আরো বিশ-ত্রিশ কাপ নিয়ে এসো—এই ধরো টাকা।'

চা-ওয়ালা দাম নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও গেল উধাও হয়ে।

ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বিপুল মুখুজ্জে বললেন, 'বেশিক্ষণ আর বসিয়ে রাখব না আপনাকে। আর শুধু এক ঘণ্টা বসুন।'

'তা হলে তো পাঁচটাই বেজে যাবে!'

'বাজুক না, একসঙ্গে বাড়ি ফিরব, মশাই। আমেরিকান গাড়ি কিনেছেন। যুক্তফ্রন্টের আমলেও আমেরিকান গাড়ি কেনবার সাহস আছে। আপনার প্রকাণ্ড বড় গাড়ি মশাই। আমরা যাব আপনার সঙ্গে। ঐ পাড়াতেই আমরা ক'জন বাস করি—'

'ক'জন?' জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোকটি।

'এই জন দশেক হবে। কেউ কেউ পথে নেমে যাবে। দিন মশাই, সিগারেট দিন। বাঃ বেশ, এতো দেখছি আমেরিকান সিগারেট। কোথায়, তিলক গেলে কোথায়? এই ধরো, আমেরিকান সিগারেট খাও।'

প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে নিয়ে তিলক দত্ত উদাসভাবে ঘোষণা কবলেন, 'এতো দাদা সিগারেট খাওয়া নয়। একেবারে হার্ড কারেন্সী খাওয়া—ডলার!'

ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে বললেন, 'পুরো প্যাকেটটাই আপনারা রেখে দিন। দেখুন, অন্ততঃ সাড়ে চারটের মধ্যে যদি আমার ফাইলটা ক্লীয়ার করে দিতে পারেন। আমি ব্যবসায়ী, সারাটা দিন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নষ্ট করে গেলাম।'

তাঁর কথায় কেউ কান দিলেন না। রমেশবাবু আর বিপুল মুখুজ্জে এ-ঘরে বসেন না। তাঁরা পাশের ঘরে চলে গেলেন। সতুর টেবিলটা বেলা তিনটের পর থেকে চা পড়ে পড়ে ভিজে ওঠে। যত

বেশি ভিজে ওঠে তত বেশি দূরে সরে যায় সে। ওরই পেছনের টেবিলে বসেন তিলক দত্ত। তিনি সত্যপ্রকাশের কাছে এগিয়ে এসে বললেন। 'আপনি ঘুষও খান না, কাজও করেন না। বেশ ভাল চাকরি করছেন মশাই। বসে বসে শুধু নাটক-নভেল পড়া। চারটে বাজে। একটু উপকার করতে হবে। নিউ মার্কেট থেকে একবার টপ করে ঘুরে আসছি। নিমাই সর্দার একটা বড় স্টলের মালিক। পাঠিয়েছে একটা সের তুই ওজনের পোনা মাছ, আমার জন্য বরফের শয্যায় শুইয়ে রেখেছে। সেটা তুলে নিয়ে আসি। আমেরিকান গাড়িতে চেপে আজ বাড়ি ফিরব—ইতিমধ্যে বড়সাহেব যদি ডেকে পাঠান তা হলে বলবেন যে বাথরুমে গিয়েছি। তারপরেও যদি ফিরতে দেরি হয় তা হলে কি বলবেন ?'

'কি বলব শিখিয়ে দিন।'

'বলবেন যে বড় বাথরুম করতে গিয়েছেন কিনা সেই জন্য দেরি হচ্ছে।'

ঘরের অন্য কোণা থেকে ছোকরা কেরানী নিতাই গুপ্ত বলে উঠল, 'ভয় নেই, দাদা। ফেরবার মুখে সব্জির বাজারটাও একবার ঘুরে আসবেন। দার্জিলিং থেকে নতুন ফুলকপি এসেছে। গো অ্যাহেড। বড় সাহেবের চেয়ার খালি। তাঁর চাপরাশীটা বেঞ্চিতে বসে টেনে ঘুম লাগিয়েছে—পৌনে পাঁচটার আগে সে ঘুম থেকে উঠবে না। বড় সাহেব ফাইল সই করবার জন্য পৌনে পাঁচটায় আসবেন।'

'বড় সাহেব কি না, তাঁর সাতখুনও মাপ। জয় মা কালী। তোমার মনে কি আছে জানি না। মাসের মধ্যে আট দশ দিন তাঁর মুখই দেখতে পাই না। যাই, চুপ করে একবার নিউ মার্কেটটা ঘুরে আসি'—প্রকাণ্ড বড় একটা হাই তুলে তিলক দত্তই বললেন। 'ফুলকপি দিয়ে পোনা মাছের ঝোল খাব আজ। খোদা বক্সের স্টলটাও ঘুরে আসব একবার। বলেছে, ছোলা-খাওয়া ভেড়ার

একটা রাং রেখে দেব। খোদা বক্স স্টলের ভাড়া বাকী রেখেছে—বেশ মোটা টাকা বাকী রেখেছে হে—'

নিতাই গুপ্ত বলল, 'যুক্তফ্রণ্টের আমলেও একটি পয়সা দেয় নি। সাহস আছে বটে খোদা বক্সের! বলে হিন্দুস্থান হামারা, নিউ মার্কেট ভি হামারা। বলে, প্রায় প্রত্যেক দিনই আধখানা ভেড়া করপোরেশনের বাবুদের দিতে হয়—

'দেবে না কেন? পার্ক লেনে একটা বাড়ি তুলেছে, মস্ত বড় গাড়ি। প্রতিটি ইঁটের মধ্যেই বে-আইনী কীর্তি। যাই, টপ্ করে একবার ঘুরে আসি।' বেরুতে গিয়েই সামনে পড়ল যতীন। ভদ্রলোকটির পয়সায় আবার সে কেটলী ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। খপ্ করে চা-ওয়ালার হাত থেকে কেটলীটা টেনে নিয়ে তিলক দত্ত আরো এক কাপ চা ঢেলে বললেন, 'ব্যাপার কি রে যতীন। করপোরেশনের বিল্ডিংটার হাড়ের মধ্যে গিয়েও ঠাণ্ডা পৌঁছচ্ছে—আর এক পেয়ালা দিবি নাকি?'

'এখনো অ্যাসেসমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের বাবুরা চা পান নি—ঐ দেখুন, ঘরের বাইরে চাপরাশীগুলোও এসে হাজির হয়েছে। বিল্ডিংয়ের সর্বত্রই খবর রটে গিয়েছে—'

টেবিলের ওপর পেয়লাটা নামিয়ে রেখে তিলক দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন। 'কি খবর?'

'ঐ বাবুটি নাকি মস্ত ধনী লোক। ছেলেবেলায় লেকের ধারে ঘুরে ঘুরে মুড়ি-ভাজা বিক্রি করতেন।'

'তা হলে তো আরো কয়েকটা দিন ঘোরাতে হয়—কয়েক পেয়ালা চা খাওয়ালেই প্ল্যান পাস হয় না।' বেরিয়ে গেলেন তিলক দত্ত।

কথাগুলো ভদ্রলোকটি শুনতে পান নি। সত্যপ্রকাশ উঠে পড়ল। চেয়ারটা তাঁর দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনি এখানে বসুন। মনে হয় আরো কয়েকটা দিন এখানে আসতে

হবে আপনাকে। কাল থেকে এই চেয়ারটা খালি থাকবে। আপনি এসে বসবেন এখানে।'

পরদিন থেকে সতু আর চাকরি করতে যায় নি।

গল্প শুনে কানাই হাসতে লাগল।

সতু বলল, চলি, কানাইদা। সুযোগ সুবিধে পেলে মাঝে মাঝে দেখা করে যাব। দাদা যতদিন সুস্থ হয়ে না ওঠেন ততদিন তাঁর চাকরিটা আমিই করব। হেড মাস্টার মশাই দয়া না করলে এটা সম্ভব হয়তো না। দাদা বি এ বি টি পাস, আমি বি এ পাসও করিনি।'

'তোমার বাবার এতো টাকা, আর টাকার অভাবে পরিমলের চিকিৎসা হচ্ছে না! একটু দাঁড়াও, দেবদাসবাবু একটা খাম রেখে গিয়েছিলেন। খামটা তোমায় দিয়ে দিতে বলেছেন। বেশ মোটা খাম।'

'কি আছে ওতে?'

'সারবস্তু কিছু আছে বলে মনে হয় না।' মৃদু হেসে কানাই বলল, 'গীতা বৌদি নাকি তোমায় একটা চিঠি লিখে গিয়েছেন— দেবদাসবাবু বললেন, লম্বা চিঠি, বোধহয় প্রেম-প্রণয়ের কাহিনী।'

'আজ থাক, কানাইদা। দাদার ওখানে বসে লম্বা চিঠি পড়বার অসুবিধে অনেক। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট আছে বটে, কিন্তু খুব দরকার না পড়লে সেটা জ্বালানো হয় না।'

'ঘরটা সব সময়েই অন্ধকার থাকে বুঝি?

'না। ঘরের পাশেই রাস্তা। তার ধারেই ল্যাম্প পোস্ট। রাস্তার আলো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাতে বই কিংবা চিঠি পড়ার অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য কাজ করতে অসুবিধে হয় না। কানাইদা, কত বছর হয়ে গেল, কই একদিনও তো পণ্ডিতিয়া রোডে গিয়ে উঁকি দিয়ে এলে না? দাদাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার? দাদা কিন্তু তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন।'

চুপ করে রইল কানাই। কি জবাব দেবে তাই বোধহয় ভাবছিল। তারপর কোনো কথা না বলে সে চলে গেল পাশের ঘরে। আলো জ্বালাতেই গোটা কয়েক ইঁদুর ছুটে চলে এল এই দিকে। এই ঘরেও আলো জ্বলছিল। 'আলো ওরা সহ্য করতে পারে না।' স ত্যপ্রকাশ দেখল, এই ঘরটার বাঁ দিকে মস্তবড় একটা ফাটল। বটগাছের শেকড়টা বোধহয় স্নানঘরের তলা দিয়ে এই দিকে এগিয়ে এসেছে। ইঁদুরগুলো ঢুকে পড়ল ঐ ফাটলটার মধ্যে।

খামটা নিয়ে এসে কানাই বলল, 'খুব সাবধানে টিনের বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলাম। ইঁদুরগুলোর দাঁতের ধার বেড়েছে খুব।'

'যতই ধার বাড়ুক, বাবার সিন্দুকের গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারবে না। চলি কানাইদা'—খামটা নিয়ে নিল সতু। তারপর বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

বিনা কারণে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকবার হুকুম নেই। সতপ্রকাশ বেরিয়ে যেতেই আলোগুলো নিবিয়ে দিল কানাই। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে শুধু শুধু পয়সা দেওয়ার পক্ষপাতী নন গোপীবাবু। যুক্তফ্রণ্ট উঠে যাওয়ার পরেও আলো জ্বালিয়ে একটু শৌখিনতা করবার সুযোগ পায়নি কানাই।

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েই সতুকে চলে যেতে দেখল কানাই। একটু বেশি বিদ্যুৎ পুড়লে পরের মাসের বিল থেকে বাবু তা ধরে ফেলেন। কানাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন।

এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে সতু। এ-যাওয়া একটা সাধারণ নয়। এর মধ্যে ভবিষ্যতের ভাবনা রয়েছে। সত্যপ্রকাশ যদি আবার কখনো ফিরে আসে এখানে তা হলে সে একা আসবে না। সঙ্গে করে নতুন চিন্তার হাতিয়ার নিয়ে আসবে।

এইটাই হচ্ছে গোপীমোহনের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা।

উদ্দেশ্যহীনভাবে আরো খানিকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল

সতু। বস্তিতে ফিরে আসতে আসতে প্রায় রাত দশটা বাজল। রাস্তা থেকেই সতু দেখতে পেল, দাওয়ায় বসে সুনন্দা বউদি তন্ময় হয়ে সিগারেট টানছেন। গীতা বউদি আর দেবদাকে তিনিও খুব ভাল করে চিনতেন। পার্টির কাজে দেবদা নিয়মিত চাঁদা দিতেন। চাঁদা আদায় করে আনতেন বউদি। একবার বেশ মোটা টাকা আদায় করে এনেছিলেন। গীতা বউদি যে আত্মহত্যা করেছেন তিনি তা জানেন না।

সতু এগিয়ে আসতেই সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি ঠাকুরপো? এত রাত অবধি কোথায় ছিলে? বলে গিয়েছিলে তো নৈহাটি যাচ্ছ।'

'নৈহাটি থেকে সন্ধেবেলা ফিরে এসেছিলাম। পূর্ণদাস রোডে গিয়েছিলাম। বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি। কানাইদার সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল। দাদা কেমন আছে?'

'ঘুমচ্ছে। বাণ্টুও ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত ন'টা পর্যন্ত তোমার জন্য বসে ছিল। ঘেরাও-আন্দোলনটা বোধহয় শেষ পর্যন্ত ফেঁসেই গেল। বাণ্টু তাই বলছিল।

এই সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করল না সত্যপ্রকাশ। মিনিট দুই চুপ করে থেকে সে বললে, 'তোমায় একটা খারাপ খবর শোনাতে চাই।'

'কি খবর?'

'গীতা বউদি আত্মহত্যা করেছেন।'

'কবে?'

'বোধহয় দিন চার আগে।'

'কই, আগে আমায় বলিস নি তো?'

'ভুলে গিয়েছিলাম?'

'কেন আত্মহত্যা করল সে? দেবদাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর?'

'না।'

'বোধহয় রাত দশটা বেজে গিয়েছে। তবু চল্। তাকে একবার টেলিফোন করে আসি। ছি, ছি, দেবদাস কি ভাবছে জানি না।'

'কোথা থেকে টেলিফোন করবে?'

বস্তি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পণ্ডিতিয়া রোডের দক্ষিণ দিকটায় নতুন নতুন কয়েকটা বাড়ি উঠেছে। তার মধ্যে শশাঙ্কবাবুর বাড়ীটাই সবচেয়ে বড়—মস্ত বড় ম্যানশন। অনেক ভাড়াটে বসিয়েছেন শশাঙ্কবাবু। তিনি নিজে থাকেন সবচেয়ে উঁচুতলায়। সুনন্দা লোকটির সঙ্গে ভাব করেছে। একতলায় তাঁর অফিস ঘর। টেলিফোন করবার দরকার হলে সুনন্দা এখানেই আসে। শশাঙ্কবাবু তার কাছ থেকে পয়সা নেন না। উপরন্তু পার্টির তহবিলে মাঝে মাঝে টাকা দেন। সুনন্দাকে খুবই খাতির করেন তিনি। সতু আর সুনন্দা এগিয়ে আসতেই দেখল, মত্ত অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন শশাঙ্ক ঘোষ। খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করতে করতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাত্রে? কি খবর? চাঁদার দরকার আছে বুঝি?'

'না। খুব একটা জরুরী দরকার, আপনার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে চাই।'

'একবার? একশোবার টেলিফোন করুন। কংগ্রেসকে উৎখাত করবার জন্য হাজার বার টেলিফোন করুন। ওরা আমার বহু টাকা খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা ডেপুটি মিনিস্টার পর্যন্ত করে নি। কমরেড আপনাদের রাজত্বে আমি কি হব? বিপ্লব শুরু হতে আর কতদিন বাকী?'

সুনন্দা বলল, 'আপনার দারোয়ানকে বলুন না, অফিস ঘরটা একবার খুলে দিক।'

'হাজার বার খুলবে—কংগ্রেস থেকে সেই লোকটাকে তাড়াবার জন্য আরো দ্বাদশ বর্ষ অফিস খুলে বসে থাকবে আমার দারোয়ান।

এই ছোটেলাল—' চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন শশাঙ্ক ঘোষ। 'ছোটেলাল। আরে এই ছোটেলাল, তুম কাঁহা গিয়া? দেখুন ব্যাপার, আমার একশো টাকা মাইনের নাইট গার্ড দাওয়ার ওপর দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী সুন্দর ডিউটি দিচ্ছে। কমরেড্‌, এই সুযোগ—আমি বলছি এই হচ্ছে গিয়ে সুবর্ণ সুযোগ—'

'কিসের সুযোগ শশাঙ্কবাবু?'

'ওদের লাথি মারবার—' দাওয়ার ওপর উঠে ছোটেলালের গায়ে লাথি মারলেন শশাঙ্ক ঘোষ। হুড়মুড় করে উঠে বসে ছোটেলাল জিজ্ঞাসা করল 'কেয়া হুয়া?'

'তোমারা মুণ্ডু হুয়া—মারেগা আরো একঠো লাথ। কমরেড লোগ খাড়া হ্যায়—'

হঠাৎ শশাঙ্কবাবুকে চিনতে পেরে এক শো টাকা মাইনের নাইট গার্ড বলল, 'কসুর হুয়া, হুজুর।'

'এ ব্যাটা তবু কসুর স্বীকার করল। ওরা তাও করে না। আমার বহু টাকা খেয়েছে—ছোটেলাল, আয় আমার সঙ্গে। ওপর থেকে চাবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণ না বিপ্লব শুরু হয় ততক্ষণ বসে বসে আপনারা টেলিফোন করুন।'

টলতে টলতে শশাঙ্কবাবু চলে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

সুনন্দা টেলিফোন করল দেবদাস মিত্রকে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করতে হল। প্রথমে টেলিফোনটা শুধু বেজেই যাচ্ছিল। সতু বলল, 'দেবদা এত বেশি শোকাভিভূত যে তিনি বোধহয় শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন না।'

'তবু শোনাতে হবে। কোনো শোকই চিরস্থায়ী নয়। সতু। হাসলো। কে? কে কথা বলছেন আপনি? দারোয়ান? কি বললে? দেবদাসবাবু বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে গিয়েছেন? কোথায় গিয়েছেন? হ্যালো, ঠিকানা জানো? জানো না?' রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সুনন্দাই বলল, 'খুবই অন্যায় হয়ে গিয়েছে,

সতু। তার এই দুঃসময়ে আমরা কেউ একবার টেলিফোন পর্যন্ত করলাম না!'

'গীতা বউদির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে দেবদা হয়তো খুশীই হয়েছেন। বলা যায় না—'

'সে কি, কথা! তবে বাড়ি বিক্রি করলেন কেন?'

'বোধহয় ভূতের ভয়ে।'

'না, না। কাল চল্ একবার, তাঁর খোঁজ করে আসি।'

'কাল আমরা এস্প্লানেড যাব আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে।'

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বস্তিতে।

চৌরঙ্গীর দিকে পথ ধরলেন গোপীমোহন। এস্প্লানেডের দিক থেকে বাঙালী ছেলেরা উল্টো দিকে ছুটছে। সাতষট্টি শেষ হচ্ছে। আগামীকল্য আটষট্টি শুরু হবে। নিউ মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করবার ইচ্ছা নেই তাঁর। কাউকে তিনি উপহার দেবেন না, কাউকে তিনি ভয় করেন না। নববর্ষের উত্তেজনা অনুভব করছেন না। শুধু ভাবছেন, কেটে বেরিয়ে যেতে হবে। দুটো দেয়াল ধ্বসে পড়লেই হল। পরিমল বাঁচবে না, সুনন্দাও প্রসব করবে না।

গাড়িটা দূরে রেখে পায়ে হেঁটে আইন-অমান্য আন্দোলনটা দেখতে চললেন তিনি। বাণ্টু কি আইন অমান্য করতে আসতে নি? ভিড়ের মধ্যে বাণ্টুকেই খুঁজতে লাগলেন গোপীমোহন।

ভিড় ভেঙ্গে যাচ্ছে, বোধহয় যারা আইন অমান্য করতে এসেছিল তারা অনেক আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে। এরা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী। এখন গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

ফিরে এলেন গোপীমোহন। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে। সিনেমা দেখবার ভিড়ও নেই। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে ঢুকে পড়তেই প্রথমে দেখা হল সতুর সঙ্গে। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

'এই যে বাবা, তোমাকে পেয়ে আমাদের একটা প্রবলেম মিটে গেল। গোপীমোহনের বাহুতে হাত রেখে সতুই বলল, 'বেলা দশটায় ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। বাবা, গোটা দুই টাকা দিয়ে যাও।'

'এই বাজারে দু'টাকায় কি খাবি ?'

'তা হলে পাঁচটা টাকা দিয়ে যাও—' গোপীমোহনের হাত চেপে ধরল সত্যপ্রকাশ। ওদের ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেল। পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা যে এই ধরণের হতে পারে সরল বাঙালীরা তা বুঝতে পারল না। আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় স্বাভাবিকতা থাকতেও পারে না। তা ছাড়া ভিড়ের মধ্যে ভদ্রবেশী পিক্‌পকেটাররা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা তাই বা এরা জানবে কি করে ?

একজন সতুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে দাদা ? পুলিসের গুপ্তচর নাকি ?'

অন্য একজন প্রশ্ন করল, 'পিক্‌পকেট নাকি ? বলুন তো দু ঘা লাগাই—'

সাবধান হলেন গোপীমোহন। জনতার মুড ভাল নয়। হট্ট-গোলের সময় অজুহাতেরও দরকার হয় না। মারধোর শুরু করে দিতে পারে। গোপীমোহন তাই বললেন, 'আপনারা এখানে ভিড় করছেন কেন ? আমি হচ্ছি গিয়ে এই ছেলেটির বাবা। কেটে পড়ুন

'সত্যি তো দাদা ?' সতুকে তবু একজন প্রশ্ন করল। প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে গোপীমোনহকে সতু বলল, 'পাঁচ টাকায় কুলোবে না। আমার মাইনে পেতে এখনো দু-চার দিন দেরি আছে। দশ টাকা দিয়ে যাও—।'

জনতা আরো ঘন হয়ে দাঁড়াল। পেছনের লোকেরা এখনো কিছু বুঝতে পারেনি বলেই ক্রমশই চাপ বাড়াচ্ছিল।

গোপীমোহন তাড়াতাড়ি বললেন, 'বিশ টাকাই দিচ্ছি।'

সত্যপ্রকাশ তখন জনতাকে উদ্দেশ করে বলল, 'উনি আমার

বাবা। আমাদের প্রাইভেট ব্যাপারের মধ্যে আপনারা কেন নাক গলাতে এলেন? এগিয়ে যান, এগিয়ে যান।'

'তাই বলুন দাদা, উনি আপনার পিতা। আজকাল কি আর প্রাইভেট ব্যাপার বলে কিছু আছে? সবই গণজনের হাতে। তা আপনিই বা দাদা ওঁর কাছ থেকে জবরদস্তি টাকা আদায় করছেন কেন?'

অন্য একজন এগিয়ে গোপীমোহনকে বলল, 'আপনিই বা দাদু ছেলেকে পাঁচের জায়গায় বিশ দিচ্ছেন কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি আপনি ওর পিতা। কিন্তু তাই বলে জুলুম আপনি সহ্য করবেন?'

একটা সেপাই এসে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এল একটা চিনেবাদাম-ওয়ালা। একজন চিরুনী বিক্রেতাও এল। সত্যপ্রকাশের মাথার চুল এতো বেশি উসকো-খুসকো হয়ে ছিল যে, একটা চিরুনী সে বিক্রি করতে পারবেই ভেবে সতুর দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরে বলল, 'যেটা পছন্দ হয় আপনি বেছে নিন। দাম একই।'

ব্যাপার দেখে গোপীমোহন করুণ সুরে ডাকলেন, 'সতু—'

'বাবা—' সতুর সুরও করুণ।

'বড্ড দেরি হয়ে গেল, চল্ চল্।' সামনের দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন গোপীমোহন। পেছনে পেছনে ছুটে গিয়ে সত্যপ্রকাশ বলল, 'দাঁড়াও বাবা। টাকাটা দিয়ে যাও।'

কোনো কিছুই ঘটল না দেখে জনতা হতাশ হয়ে মিশে গেল এদিক ওদিকে।

'তাড়াতাড়ি দিয়ে যাও বাবা। জনতা আবার এসে ঘিরে ধরতে পারে। বাণ্টুকে একটা রেস্তোরাঁয় বসিয়ে রেখে এসেছি।'

'রেস্তোরাঁয় বসে কি করছে সে?'

'ওর ডান পায়ে পুলিস একটা লাঠি মেরেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বলে বসিয়ে এসেছি। এখন গিয়ে একটু ভাল জিনিস খাওয়া-দাওয়া করব। পার্স বার করো, টাকা দাও।'

'রেস্তোরাঁটা কোথায় ?'

'ঐ তো সামনেই। কুড়ি টাকাই দিলে ? ধন্যবাদ বাবা। যাক, শেষ পর্যন্ত জনতার সাহায্য ছাড়াই তোমার কাছ থেকে টাকা বার করতে পারলুম।'

'চল, আমিও সামনের দিকেই এগুব। ঐ রাস্তার কোণায় গাড়িটা পার্ক করে রেখে এসেছিলাম।' এগিয়ে যেতে যেতে গোপী-মোহন বললেন, 'তোর নিজের টাকাই তোকে দিলাম। আমার টাকা খসাতে পারিস নি।'

'আমার টাকা এল কোত্থেকে ?'

'গীতা বউদির কাছ থেকে।'

'তিনি আত্মহত্যা করেননি ?' সতু যেন আকাশ থেকে পড়ল !

'করেছেন, আত্মহত্যা করবার ঘণ্টা তুই আগে আমার কাছে এসেছিলেন। আমার হাতে একটা মস্তবড় খাম দিয়ে বললেন যে, মুখটা গালা দিয়ে বন্ধ করে এনেছেন। কারণ ওতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা আছে। এই টাকাটা তিনি তোকে দিতে বললেন। টাকা বলেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। কোনো কিছুই জানতে চাইলাম না। খানিকটা আলোচনা করলে হয়তো তার মনের উদ্দেশ্যটা জানতে পারতাম। তিনি যে দু'ঘণ্টা পরেই আত্মহত্যা করবেন সেটাও প্রকাশ হয়ে পড়ত। প্রকাশ হয়ে পড়লে এই টাকাটা তুই পেতিস না সতু।'

'এখনো তো পাই নি।'

'গচ্ছিত রেখেছি, পেয়ে যাবি। কাল একবার আসিস।'

রেস্তোরাঁর পাশ দিয়েই গলিটার দিকে এগিয়ে গেলেন গোপী-মোহন। খাওয়ার সময় বাইরে থেকেই বাণ্টুকে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন না। ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

রাত আটটা বেজে গিয়েছিল। গঙ্গার দিকে বেড়াতে গেলেন তিনি। এখনো গা গুলোচ্ছে। কেটে বেরিয়ে যাওয়ার মনোভাব প্রবল। কোথাও না দাঁড়িয়ে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বত্রিশ সনের ফোর্ড একবারও বন্ধ হয়নি আজ। অদ্ভুত ভাল কাজ দিচ্ছে। চারটে চাকাই নতুন। আনকোরা নতুন। শ-মাইলের বেশি চলে নি। ময়দানের দিক থেকে তিনি পার্ক স্ট্রীটে ঢুকলেন। লাল আলোটা নিভে গিয়েছিল। দাঁড়াতে হল না। রাত এখন সাড়ে ন'টারও বেশি। বোধহয় পৌণে দশ হল। পার্ক স্ট্রীটও নির্জন হয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। রেস্তোরাঁর ভেতরে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। আজ রাত্রে বাড়ি গিয়ে তিনি কিছু খেয়ে নেবেন। তা ছাড়া একা একা খেতে হয় বলে অনেক সময় ভাল খাবারও বিস্বাদ ঠেকে। স্ত্রী নেই, সন্তানরাও কেউ নেই। ভাড়াটে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বসে মাঝে মাঝে খান বটে, কিন্তু স্ত্রী কিংবা সন্তানদের সঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দ তাতে থাকে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতাও বাড়ছে।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে আসতেই লাল আলোটা নিভে গেল। পর পর দুটো মোড়ই আজ খোলা পেয়েছেন। তারপর সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজটাও পার হয়ে এলেন। পার্ক সার্কাস হয়ে বাড়ি ফিরবেন তিনি। রডন স্ট্রীট পার হতেই চমকে উঠলেন গোপীমোহন। রাস্তাটা আধো অন্ধকার। হেড লাইট মারলেন। পার্ক সার্কাসের মোড়ের দিকে হেঁটে চলেছে সতু। ভবিষ্যতের পার্টিম্যান। তার পাশে বাণ্টু। পুলিশের লাঠি খেয়েও পা-টা পুরোপুরি খোঁড়া হয় নি। হেড লাইট দুটো নিভিয়ে দিলেন গোপীমোহন। পেছনের লাইটও বন্ধ করলেন। গাড়ির গতি বাড়াতে লাগলেন। বত্রিশ সনের ফোর্ড প্রবল উদ্যমে ছুটে চলল। গাড়ির আওয়াজটা সতুর চেনা। কিন্তু উপায় নেই। গতির শেষ সীমানায় পৌঁছোলেন তিনি। গা গুলনো বন্ধ হল। নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'কেটে

বেরুতে হবে। ডেথ্ টু সতু, ডেথ্ টু বাণ্টু—হাঃ হাঃ হাঃ – হিঃ হিঃ হিঃ—লঙ লিভ মাই সন, লঙ লিভ মাই গ্র্যাণ্ড—'

চকিতের মধ্যে বাণ্টুকে একটা হেঁচকা টান মেরে ফুটপাতের ওপর টেনে নিয়ে এল সত্যপ্রকাশ। সতুকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। ভোর রাত্রির হিমের মতো ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল বাণ্টুর চোখ দিয়ে।

পার্কসার্কাসের মোড়ে এসে গাড়িটা ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল। ভেঙে গেল গাড়ি, মুছে গেল একটা ঐতিহ্য, ছিন্ন হয়ে গেল একটা ধারাবাহিকতা, গুঁড়ো হয়ে গেল একটা প্রতিষ্ঠান।

নতুন প্রভাতে কি হবে বলা যায় না। এখনো মোড়ের মাথায় লাল আলোটা জ্বলছে।

জ্বলবে। ল্যাম্পপোস্টটা ভাঙে নি।

———